# মাণ্ডুক্যোপনিষদের কথা

ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতামালা

# মাণ্ডূক্যোপনিষদের কথা

## ( মাণ্ডূক্যতত্ত্বসমীক্ষা )

### প্রথম সমীক্ষা

শীর্ষস্থানীয় উপনিষদগুলির মধ্যে মাণ্ডূক্যোপনিষদ সংক্ষিপ্ততম। এতে কোনও আখ্যায়িকা নেই, কোনও কথোপকথন নেই, কোনও কাব্য নেই, কোনও যাগযজ্ঞের উল্লেখ নেই, ওঁকারের উপাসনার কথা থাকলেও মৌল দার্শনিক তত্ত্বকথার সঙ্গে একেবারে অপৃথক্‌ভূত হয়ে আছে। এটি এমন উপনিষদ যাতে সমগ্র বেদান্তের সার কথা সোজাসুজি বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর তো খোলাখুলি এটিকে এবং এতৎসহ গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকাকে "প্রকরণগ্রন্থ" আখ্যা দিয়ে এদের অনুবন্ধচতুষ্টয়ও খুঁজে বার করেছেন।

সমগ্র উপনিষদটি নিম্নের কয়েকটি অনুচ্ছেদে অনুবাদ করা যেতে পারে।[১]

"এই সমস্তই" ( অর্থাৎ, জগতের যা-কিছু এবং তদতিরিক্ত যা-কিছু তৎসমস্তই ) " 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক" ( মন্ত্রাত্মক )। "সেই ওঁকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ কথিত হইতেছে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমস্তই ওঁকার; এবং অপর যাহা কিছু ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঁকারই।"

"এই সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মা ব্রহ্ম; উক্ত এই আত্মা চতুষ্পাৎ" ( চারি পাদবিশিষ্ট, অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান তিন অংশে বা কলায় এবং সমগ্রভাবে নিষ্কল 'চতুর্থ' রূপে বোদ্ধব্য )।

"জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন" ( অর্থাৎ বাহ্যজগৎ যাঁহার অনুভূতির বিষয় ), "যাঁহার সাতটি অঙ্গ" ( সূর্য-চক্ষু, বায়ু-প্রাণ, আকাশ-শরীর, জল-মূত্রাশয়, পৃথিবী-পাদদ্বয় ও আহবনীয় অগ্নি-মুখ ) "যাঁহার উনিশটি মুখ" ( দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ), "যিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন—সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ।" ( সমষ্টি ভাবে 'বৈশ্বানর,' ব্যষ্টিভাবে 'বিশ্ব'। )

"স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, যাঁহার সাতটি অঙ্গ, উনিশটি মুখ, যিনি শুধু বাসনা ( সংস্কার ) ভোগ করেন সেই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।" ( ব্যষ্টিভাবে 'তৈজস,' সমষ্টিভাবে 'সূত্রাত্মা' বা 'হিরণ্যগর্ভ'। )

---

১। অনুবাদটি প্রায় পুরোপুরিই স্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত 'উপনিষদ গ্রন্থাবলী'র প্রথম ভাগ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

"সুপ্তব্যক্তি যে কালে কোনও কাম্যবস্তু প্রার্থনা করেনা এবং কোনও স্বপ্ন দেখেনা, তাহাই সুষুপ্তি। যিনি সুষুপ্তিতে স্থিত, সর্ববিক্ষেপ-রহিত, কেবল অনুভূতিস্বরূপ, আনন্দময় এবং অসন্দিগ্ধরূপে, অনায়াসে আনন্দ-ভোগকারী ও স্বপ্নাদির দ্বারস্বরূপ" ( কারণ, সুষুপ্তাভিমানী 'প্রাজ্ঞ' নামক পুরুষ থেকেই স্বপ্ন ও জাগরণ উৎপন্ন হয় ), "সেই প্রাজ্ঞই (আত্মার) তৃতীয় পাদ।" ( ব্যষ্টিরূপে প্রাজ্ঞ, সমষ্টিরূপে ঈশ্বর। )

"ইনিই সর্বেশ্বর, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উপাদান-কারণ, ইনিই ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থান।"

"যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্তী নহেন" ( অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই অংশিক ভাবে থাকেন না ), "প্রাজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা নহেন, জড় নহেন, যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, যিনি কেবল 'আত্মা' এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ মনে করিয়া থাকেন।" ( অর্থাৎ মিথ্যা সর্পে রজ্জুর মতো অবিদ্যাকল্পিত পাদত্রয়ে অনস্যূত যে পরমাত্মা তাঁকে তুরীয় বা চতুর্থ মনে করিয়া থাকেন। ) "তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়।"

"( অভিধেয়প্রাধান্যে বর্ণনাকালে" অর্থাৎ বস্তুর standpoint—দৃষ্টিকোণ-থেকে, "যে ওঁকার আত্মার সহিত অভিন্ন ) অভিধানপ্রাধান্যে বর্ণনাকালেও" অর্থাৎ বাচক শব্দ ওঁকারের standpoint—দৃষ্টিকোণ—থেকেও, "সেই প্রণব আত্মা হইতে অভিন্ন। এই ওঁকার মাত্রারূপেও ( অর্থাৎ মাতৃকা=letters রূপেও ) বর্তমান; আত্মার পাদ" কলা বা অংশ "সমূহই প্রণবের মাত্রা এবং প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ", বা কলা বা অংশ—"অকার, উকার ও মকার ইহারাই প্রণবের মাত্রা।"

"বৈশ্বানর ও অকার উভয়েই ব্যাপক অথবা উভয়ই আদি বলিয়া জাগরিত-স্থান বৈশ্বানরই প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার। যে উপাসক এইরূপ জানেন, তিনি সমুদায় কাম্যবিষয় লাভ করেন এবং সর্বাগ্রণী হইয়া থাকেন।"

"তৈজস এবং উকার উভয়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া অর্থাৎ উভয়ই মধ্যবর্তী বলিয়া স্বপ্ন-স্থান তৈজসই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকার। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহকে বর্ধিত করেন, তিনি শত্রু ও মিত্রের নিকট তুল্যরূপ হন। ইঁহার কুলে অব্রহ্মজ্ঞ জাত হন না।"

"প্রাজ্ঞ ও মকার উভয়ই পরিমাপক অথবা বিলয়ের আধার বলিয়া সুষুপ্ত-

স্থান প্রাজ্ঞই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার। যে উপাসক এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত জগতের পরিমাপক হন ( অর্থাৎ জগতের যাথার্থ্য"—যথার্থ স্বরূপ—"জানেন ), এবং আশ্রয়স্বরূপও ( অর্থাৎ জগতের কারণ স্বরূপও ) হইয়া থাকেন।"

"এইরূপে যথোক্ত জ্ঞানবানের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া ( অবশেষে ) মাত্রাবিহীন ওঁকার তুরীয়, ব্যবহারাতীত, জগতের নিবৃত্তিস্থল," ( যেমন রজ্জু মিথ্যাসর্পের নিবৃত্তিস্থল ), "মঙ্গলময়" ( অর্থাৎ পরমানন্দ ), "অদ্বিতীয় আত্মরূপেই (পর্যবসিত ) হয়। ( তুরীয়স্বরূপ ওঁকার বা পরমাত্মায় পাদ ও মাত্রা নাই। সুতরাং যথোক্ত জ্ঞানবানের দ্বারা প্রযুক্ত ওঁকারের পূর্ব পূর্ব বিভাগ উত্তরোত্তর বিভাগে লীন হইয়া ক্রমে পরমাত্মাতেই পর্যবসিত হয়। ) যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। তাঁর পুনর্জন্ম হয় না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"

অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে :

১। ওঁকার তো শব্দমাত্র এবং তার তিন মাত্রা তো তিন বর্ণ; এদিকে বিশ্ব ( দেহবান ব্যষ্টি মানব ও তার ভোগ্য সঙ্কীর্ণ স্থূল জগৎ ) বা বৈশ্বানর ( সমষ্টিরূপ বিরাট অভিমানী দেবতা ও তাঁর ভোগ্য সামগ্রিক স্থূল জগৎ ) তো অর্থ বা শব্দাতিরিক্ত পদার্থ। শব্দ হল বাচক, অর্থ হল বাচ্য। এদের একীভাব সম্ভব হয় কী প্রকারে ? প্রথম মাত্রা অকার, দ্বিতীয় মাত্রা উকার, তৃতীয় মাত্রা মকার এবং অমাত্র সামগ্রিক ওঁকার কী করে যথাক্রমে বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব বা বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ, মায়াস্বরূপ কারণশরীর-বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বরের ও তুরীয় পরমাত্মার সহিত এক হতে পারে ? নাম ও নামী একই পদার্থ—এইরূপ একটি মতবাদ এদেশে বহুল প্রচারিত। কিন্তু এই একীভাব ঠিক ঠিক বোঝা যায় কী প্রকারে ?

২। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়াকারে যা যা পাই, এবং ঐ-সব বিষয়ের যত ভোগ হয়, এমন কি স্বয়ং স্বাপ্নিক ভোক্তাটিও—সবই মিথ্যা, এ কথা ঠিক। এ-সবই মনঃস্পন্দিত, কল্পিত, পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় merely intended বা constructed, অথবা mere intentions বা constructions ; এমন কি এই-অবস্থায় স্বাপ্নিক ego টাও intended বা constructed—ঠিক যেমন কোনও রজ্জুখণ্ডকে সর্পাকারে দেখাকালীন ঐ সাপ এবং সর্পদ্রষ্টা হিসাবে 'ভীতচকিতচিত্ত জীবাত্মা'টিও মিথ্যা, অর্থাৎ মনঃস্পন্দিত বা

কল্পিত, তদ্রূপ। এ-সব কথাই ঠিক। কিন্তু ঐ মিথ্যার নিরিখে সহজ ভাবে দৃষ্ট (অনুভূত) জগৎকে এবং তদ্দ্রষ্টা আকারে তৎকালীন যে জীব তাকে মিথ্যা বা কল্পিত বলে বুঝব কেন? তা ছাড়া, স্বপ্ন জগৎটা মিথ্যা হলেও এটা যে সামগ্রিক ভাবে, অথবা খুঁটিনাটির দিক থেকে, মনঃস্পন্দিত, স্বপ্নদ্রষ্টা কর্তৃক constructed, এ-ব্যাপারটি তো মিথ্যা নয়। আবার, স্বপ্ন বা মিথ্যাবস্তু দর্শনের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর যে সুষুপ্তি তাকেই বা উচ্চতর অবস্থা এবং তাকেই বা কেন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার সত্যত্ব-মিথ্যাত্বের মানদণ্ড হিসাবে ধরতে যাব? এই তিন প্রশ্নই যদি প্রশ্ন হিসাবে সঙ্গত হয় তাহালে সর্ব-আবরণ-বিক্ষেপহীন অদ্বৈত তুরীয়াবস্থাকে, অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত সর্বপ্রকার ভেদশূন্য অদ্বৈত পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বা কেন একমাত্র এবং চরম শ্রেয়োরূপে গণ্য করতে যাব? মিথ্যা, মিথ্যাতর ও মিথ্যাতমকে এতটা উচ্চাসনে বসিয়ে সর্বজীব-স্বীকৃত প্রত্যক্ষীভূত এই স্থূল জগৎ এবং এর অনুভবিতা, ভোক্তা, স্থূল-দেহাভিমানী জীবাত্মাকে মিথ্যা, মিথ্যাতম, বলে মানতে যাব কেন? অথবা, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তই স্ফুট হয় না কি যে চিৎ-রূপ আত্মা আপন স্বভাবেই (sui generis) আপনার বাইরে কিছু একটা সৃষ্টি করতে, উপস্থাপিত (construct বা project) করতে চায় যার বস্তু (content) নির্ভর করে পূর্বসঞ্চিত (অথবা প্রারব্ধ) সংস্কার-বাসনাদির উপর?

৩। সুষুপ্তির পরেও তুরীয় মানবার কী যুক্তি থাকতে পারে? মাণ্ডুক্যো-পনিষদেই তো পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে "সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ।" এতটাই যখন পাওয়া গেল, তখন এর পরেও কী আছে দেখবার প্রয়োজন কী? এখানেই কি চরম অদ্বৈত মিলল না?

প্রথমে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর কী, দেখা যাক্। পরে, ক্রমে ক্রমে, আরও যে-সব প্রশ্ন উঠবে তাদের উত্তর যথাযোগ্য স্থানে দেবার চেষ্টা করা হবে। এজাতীয় প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মাণ্ডুক্যোপনিষদের মাহাত্ম্য—মোটকথায়, অদ্বৈততত্ত্বের মাহাত্ম্য—পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হবে না। এ-জাতীয় অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন শ্রীগৌড়পাদ তাঁর চতুষ্প্রকরণ মাণ্ডুক্যকারিকায় এবং গৌড়পাদপ্রশিষ্য আচর্য্য শঙ্কর দিয়েছেন মাণ্ডুক্যকারিকার উপর রচিত তাঁর ভাষ্যে। শঙ্করের বক্তব্য আরও বিস্তারিত করেছেন

আনন্দগিরি শঙ্করভাষ্যের উপর রচিত তাঁর টীকায়। গৌড়পাদের কারিকার প্রথম প্রকরণের নাম আগমপ্রকরণ, দ্বিতীয় প্রকরণের নাম বৈতথ্যপ্রকরণ, তৃতীয়ের নাম অদ্বৈতপ্রকরণ এবং চতুর্থের নাম অলাতশান্তিপ্রকরণ। প্রথম প্রকরণে তিনি মূল উপনিষদটির বক্তব্য স্বরচিত উনত্রিশটি কারিকায় ( অন্যান্য নানা উপনিষদ বাক্যের উদ্ধৃতি সমেত ), এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালীন আমাদের যদ্‌যদ্‌বিষয়ক যে-যে প্রকার অনুভব হয় তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে, সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপিত করেছেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালীন অনুভবের এই অদ্ভুত বিশ্লেষণ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্ট ও আধুনিক ফেনোমেনোলজিস্ট এবং অস্তিবাদীদের analysis of experience-এর সমগোত্রীয় তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই সূক্ষ্মতর। আচার্য শঙ্কর তো এ-জাতীয় অনুভব-বিশ্লেষণে পারঙ্গম। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গৌড়পাদ ও শঙ্কর কেবল এ-জাতীয় বিশ্লেষণ কর্মেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা যেখানে যথাপ্রয়োজন যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করেছেন। মাণ্ডুক্যকারিকার দ্বিতীয় প্রকরণের সমস্তটাই এ-জাতীয় যুক্তিতর্কের বিস্তার। এই 'বৈতথ্যপ্রকরণে'র আটত্রিশটি কারিকায় গৌড়পাদ অনুভব-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক সমন্বয়ে বাহ্য ও আন্তর জগতের যাবদ্বস্তু—ও তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—ঐ ঐ বিষয়সম্বদ্ধ যাবৎ অনুভব, এমন কি তৎতৎ-অবচ্ছেদে, তৎতৎপুরস্কারে, যে অনুভবিতা তারও মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছেন; এবং শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে ঐ প্রমাণজালের আরও বিস্তার সাধন করেছেন। মাণ্ডুক্যকারিকার তৃতীয় প্রকরণে—যে প্রকরণের নাম অদ্বৈতপ্রকরণ—গৌড়পাদ এবং ঐ প্রকরণের ভাষ্য লেখন প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর বুঝতে পেরেছিলেন যে বাহ্য ও আন্তর জগতের যাবদ্বস্তু, যাবৎ অনুভব ও তদবচ্ছেদে যে অনুভবিতা তার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করলেই অদ্বৈত আত্মা বা ব্রহ্মের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে না। কারণ বৈনাশিক বৌদ্ধদের মতন অনেকে এমন কথাও বলতে পারেন যে কোথাও কিছু নিঃসন্দিগ্ধ সত্য নেই, সবই নিরবশেষে মিথ্যা।[১] এই বিকল্পের অবসর না দেবার জন্যই গৌড়পাদ তাঁর কারিকার তৃতীয় প্রকরণে আটচল্লিশটি কারিকায় শব্দপ্রমাণ ও যুক্তিতর্ক—এই উভয়ের সাহায্যেই, অর্থাৎ যথা প্রয়োজন শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে, 'অদ্বৈত আত্মা'-রূপ চরম সত্য স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অদ্বৈত গ্রন্থ রচনা করতে হলে আরও একটা কাজ বাকি থাকে। সেটা হল পরমত খণ্ডন। এই

১। বৈনাশিক বৌদ্ধরা ঠিক এই কথা এত সহজ ভাবে বলেছেন কি না সন্দেহ। পরে এ-বিষয়ে যথাস্থানে কিছু আলোচনা হবে।

কাজ শ্রীগৌড়পাদ সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করেছেন তাঁর কারিকার 'অলাতশান্তি' নামক চতুর্থ প্রকরণে একশটি কারিকার মাধ্যমে। প্রশিষ্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে 'গুরুর গুরু'র সব কথারই পূর্ণাঙ্গ বিস্তার সাধন করেছেন।

এখন দেখা যাক্ শাঙ্কর ভাষ্য ও গৌড়পাদকারিকা সমেত মাণ্ডুক্যোপনিষদে উপরিলিখিত প্রশ্ন তিনটির কী কী উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শব্দ ও অর্থের, অর্থাৎ নাম ও নামীর, একত্ব সম্বন্ধে মাণ্ডুক্যোপনিষদের ঋষি এতই নিঃসন্দিগ্ধ যে, কেউ যে এই একত্ব সন্দেহ করতে পারে এমন চিন্তাও তিনি করেন নি। তাঁর কালে হয়তো এ-জাতীয় একত্ব সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তিনি সরাসরি বলে গেছেন ওঁকারই আত্মা, ওঁকারই ব্রহ্ম, ওঁকারই সব কিছু; ওঁকারের অ-মাত্রা এবং সর্বং খল্বিদম্ যে-ব্রহ্ম তাঁর বিশ্ব বা বৈশ্বানর-রূপ যে প্রথম পাদ ( কলা ), এরা একই পদার্থ; তদ্রূপ উকাররূপ দ্বিতীয় মাত্রা ও তৈজস বা হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ ( কলা ), এবং ওঁকারের ম-কাররূপ তৃতীয় মাত্রা ও ব্রহ্মের প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বররূপ তৃতীয় পাদ ( কলা ); —"মাত্রাঃ পাদাঃ পাদাশ্চ মাত্রাঃ"। আর, শেষ পর্যন্ত অমাত্র যে ওঁকার-স্বরূপ, অর্থাৎ যে স্বরূপ-ওঁকার সব শব্দের অতীত, সেই-ই স্বয়ং সর্ব কলার অতীত নিষ্কল ( partless ) পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। গৌড়পাদের যুগে কিন্তু শব্দ ও অর্থের একান্ত একীভাব লোকের কাছে নিঃসন্দিগ্ধ ছিল না। তাই তাঁকে মাণ্ডুক্যোপনিষদের এই কথাগুলি নানা ভাবে বোঝাতে হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর ও শঙ্করের প্রধান বক্তব্য হল দুটি: ( ক ) শব্দ বা মন্ত্র হল উপাসনার মাধ্যম; নাম ও নামীর ঐক্যে বিশ্বাস রেখে নাম বা মন্ত্র জপ করলে নামীকেই, অর্থাৎ বাঞ্ছিত তত্ত্বকেই, শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ( খ ) এমন কোনও পদার্থ নেই যার নাম নেই, প্রতি অর্থেরই বাচক শব্দ আছে, শব্দ বা নাম বিনা কোন বিষয়েরই প্রতীতি হয় না: "ন সোঽস্তি প্রত্যায়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে"; তদ্রূপ প্রতি বাচক শব্দেরই অভিধেয় অর্থ আছে; এমন কি সর্বশব্দাতীত যে ব্রহ্ম তাঁরও 'যেন-বাচক' শব্দ হল অমাত্র সামগ্রিক ওঁকার, অর্থাৎ অ উ ম—এই মাত্রাত্রয়ের অতীত ওঁকারস্বরূপ। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি এই প্রকার পারস্পরিক অবিনাভাব সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ বাচক শব্দ থাকলেই যদি বাচ্য অর্থ থাকে এবং বাচ্য অর্থ থাকলেই যদি বাচক শব্দ থাকে, কোনটিকেই যদি অপরটি থেকে পৃথক না পাওয়া যায়, এবং একের অভাবে যদি অপরটির অভাব দৃষ্ট হয়, তাহলে এদের দুটি ( ভিন্ন ভিন্ন ) জিনিষ বলবার কোন যুক্তিই থাকে না।

গৌড়পাদ ও শঙ্করের এই দুটি যুক্তি সচরাচর শেষ যুক্তি, অর্থাৎ মোক্ষম যুক্তি, রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু সব কথার মূলে শাব্দিকদের যে গূঢ় তত্ত্বকথা আছে সেটি না জানা পর্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি হয় না। উপাসনার জন্য যা প্রয়োজন সেটা কোনও শেষ তত্ত্বকথা নাও হতে পারে। উপাসনার জন্য নিম্নতম প্রয়োজন প্রতীক বা symbol, উপেয় লাভের জন্য কোনও কিছুকে উপায়, এমন কি একমাত্র উপায়, রূপে গণ্য করা; এর দ্বারা কিন্তু উপায় ও উপেয়ের (সর্বাত্মক) একত্ব প্রমাণিত হয় না। তদ্রূপ শব্দ ও অর্থের একের উপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি এবং একের অভাবে অন্যের অভাব—এর থেকে কখনই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না যে, উভয়ে একই বস্তু। বড় জোর প্রমাণিত হয়, উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় কোনও সম্পর্ক আছে। যদি ওরা একই বস্তু হত তাহলে এই দুটি শব্দের, যথা 'শব্দ' ও 'অর্থে'র, অতি নিয়মিত ব্যবহার কী করে সম্ভব হল? তাছাড়া, প্রশ্ন উঠতে পারে, বিভিন্ন ভাষায় একই জিনিষের বাচক শব্দ বিভিন্ন। কোন্ শব্দের সহিত অর্থের ঐক্য এখানে বিবক্ষিত? কেবল দেবভাষাই বিবেচ্য বললে বর্তমান যুগে কোনও ইষ্টসিদ্ধি হবে না। তাছাড়া দেবভাষাতেও তো একই অর্থের (জিনিষের) বিভিন্ন বাচক নাম, এবং একই নামের বিভিন্ন বাচ্য অর্থ আছে। কোন্‌টির সঙ্গে ঐক্য বিবক্ষিত? সব কটির সঙ্গে ঐক্য একটা অসম্ভব, অবাস্তব, ব্যাপার। অতএব, একত্ব প্রতিপাদন করতে হলে অন্য কোন কথা বলতে হবে। শাব্দিক দার্শনিকরা সে-কথা বলেছেন। মাণ্ডূক্যকারিকাকার এবং শঙ্করও ভিন্ন এক প্রসঙ্গে বিশদভাবে সে কথা বলেছেন। সেই ভিন্ন প্রসঙ্গ হল জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিশ্লেষণ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিশ্লেষণের পরে আমরা এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব।

স্বপ্নের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এঁরা বলেছেন (ক) স্বপ্ন-জগতের সমুদায় দৃশ্য বস্তু মনঃকল্পিত এবং সেই অর্থেই, নিজের জোরে অস্তিত্ববান নয় বলেই, মিথ্যা; তা ছাড়া, স্বপ্নাবসানে পুনর্জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট সবই নিঃসংশয়ে মিথ্যা বলে মনে হয়, অথচ স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎকালীন বস্তুগুলি মিথ্যা বলে মনে হয় না। (খ) শুধু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলিই মিথ্যা মনে হয় না, ঐ বস্তুগুলির তৎতৎকালীন অনুভবও স্বপ্নান্তে নিঃসন্দেহে মিথ্যা মনে হয়। কোনও কোনও দার্শনিক বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সবই মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আমি যে সেগুলি দেখেছিলাম, আমার যে তৎতৎ বিষয়ে অনুভব হয়েছিল, এটা কী করে মিথ্যা হতে পারে? রজ্জুকে ভুল করে যখন সর্পরূপে দেখেছিলাম তখন—

এবং কেবল তখন নয়, এখন এবং সর্বকালেই—ঐ সর্প নিঃসন্দেহে মিথ্যা, কিন্তু আমি যে, মিথ্যা হোক্ সত্য হোক, একটা সাপ দেখেছিলাম, এ ঘটনা তো মিথ্যা নয়। অদ্বৈতবেদান্তী কিন্তু এই সর্পানুভবকেও মিথ্যা বলেন। ভ্রমকালে, অর্থাৎ যতক্ষণ ভ্রান্তদর্শনের অবসান হয় নি ততক্ষণ, অবশ্যই সর্পের ন্যায় সর্পানুভব, সর্পজ্ঞানও, সত্য বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু ভ্রমাবসানে সত্যরজ্জুদৃষ্টে যা মনে হয় তা হল এই: ভ্রমকালীন ঐ সর্প মিথ্যা, অতএব 'ঐ সর্প' সম্বন্ধীয় আমার যে অনুভব হয়েছিল তাও মিথ্যা। একটা কিছু অনুভব হয়েছিল, এটা মিথ্যা নয়; কিন্তু যেহেতু সাপটা আগাগোড়াই মিথ্যা অতএব ঐ 'সাপ-সম্বন্ধীয়' অনুভূতিও মিথ্যা। এই একই কথা স্বপ্নান্তে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও স্বপ্নরূপ অনুভবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমন কি যে-'আমি'টা সমগ্র স্বপ্নটা দেখেছিল সেই 'আমি'টাকেও জাগ্রৎ আমি অস্বীকার করি। যে-'আমি'টা তখন বিষম ভয়গ্রস্ত হয়েছিল সেই ভীত 'আমি'কে প্রকৃত (জাগ্রৎ) 'আমি'র সহিত একান্ত অভিন্ন বলে মানতে আমি অনেক সময়েই রাজি হইনা। স্বপ্নে তো আরও কত লোককে দেখেছিলাম, কিন্তু স্বপ্নকালীন বিভিন্ন ক্রিয়াবান সেই সব লোকও কি সমগ্র স্বপ্নটির সহিত মিথ্যা বলে পরিত্যক্ত হয় না? তারা যদি মিথ্যা বলে পরিত্যক্ত হয় তাহলে তাদের সঙ্গে সমসত্তাবান স্বপ্নদ্রষ্টা 'আমি'-রূপ ব্যক্তিটিই বা সত্য হতে যাবে কোন্ গরজে? সমগ্র স্বপ্নটাই যদি পরিত্যক্ত হয় তাহলে তদ্দৃষ্ট যাবৎ বস্তু ও ব্যক্তির সহিত স্বপ্নদ্রষ্টা ঐ বিশেষ 'আমি'টিও পরিত্যক্ত হয়। আমার জীবনেতিহাসের মধ্যে স্বপ্নকালের স্থানসঙ্কুলান হতেই পারে না। জাগ্রৎ জগতের এক ঘণ্টা ব্যাপী স্বপ্নে যদি সাতদিনব্যাপী (মিথ্যা) ঘটনাপরম্পরার অনুভূতি হয়ে থাকে, তাহলে সেই সাতটা দিন আমার প্রকৃত জীবনের একটি ঘণ্টার মধ্যে কী ভাবে অন্তর্ভূত হবে? প্রকৃতপক্ষে, ঐ সাতটা দিন এবং সাত দিন ব্যাপী ঘটনাগুলির কোনটিই আমি আমার জীবনেতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করিনা, করতে চাইও না। অদ্ভুত অসম্পৃক্ত ভাবে ওরা বাইরে পড়ে থাকে। স্বপ্নানুভব, স্বপ্নদৃশ্য এবং স্বপ্নদ্রষ্টা সবই মিথ্যা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এগুলি এল কোথা থেকে? সহজ উত্তর এই: জাগৎ-অবস্থা-কালীন অর্জিত ও সঞ্চিত নানা সংস্কার ও বাসনার তাড়নায় আমার চিত্ত স্বপ্নে জাগদবস্থার অনুকরণে ঐ সংস্কার ও বাসনাগুলিকে মূর্তি দেয়, অর্থাৎ তদনুসারে কল্পনা করে। সমগ্র স্বপ্নে দৃশ্য, অনুভব ও অনুভবিতা রূপে যা কিছু পাই সবই আমার কল্পনা, আমার construction,

আমার intention, projection, আমার বাইরে ওদের কোনই প্রকৃত স্থিতি নেই। জাগ্রদবস্থ জগতের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট থাকে বলে স্বপ্নে চিত্ত সেই সব আকারেই নিজেকে আকারিত করে, এবং আকারগুলিকে বহিঃস্থ বিষয় বলে মনে করে। এই বহিঃসত্তা কিন্তু সূক্ষ্ম বহিঃসত্তা, জাগ্রদবস্থায় প্রাপ্য বিষয়দের মতন এদের স্থূল বহিঃসত্তা নেই। চিত্ত স্বপ্নাবস্থায় এই মিথ্যা বহিঃসত্তা পুরস্কারে—অর্থাৎ, যেন-বহিঃসত্তাবান রূপে-নিজেরই আকারগুলি দেখে। ঐ সব আকার এবং আকারসম্বন্ধীয় জ্ঞান—এরা প্রকৃতপক্ষে পরস্পর ভিন্ন নয়। স্বাপ্ন জ্ঞানের বিষয় ঐ জ্ঞান থেকে অভিন্ন বলে বিষয়াকারে প্রতীয়মান ওটা মিথ্যা, এবং আগেই দেখান হয়েছে স্বাপ্ন জ্ঞান ও স্বপ্নদ্রষ্টা জ্ঞাতা—এরাও মিথ্যা। স্বপ্নাবসানে পুনর্জাগ্রৎ অবস্থায় এ-সবকে যে মিথ্যা বলি তার অর্থ দুটি। প্রথম, এরা সবই তখন নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়, বলতে পারি এখন জাগ্রদবস্থায় তারা তো নেইই, স্বপ্নাবস্থায়ও তারা সত্য সত্য ছিল না, কোনও কালেই ছিল না, কোনও কালেই থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত যে জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং, তার সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টা জ্ঞাতা, স্বাপ্নজ্ঞান ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়—এদের কারুরই সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি না। আত্মা এগুলি সৃষ্টি করেছিল বলতে পারি না, কারণ মিথ্যা সৃষ্টি কোন সৃষ্টিই নয়। অথচ এগুলি একেবারে কিছুই নয়, বন্ধ্যাপুত্রের মত একেবারে অসম্ভব অলীক, সম্পূর্ণ অসৎ, ও নয়, কারণ স্বপ্নে যেন-কিছু একটা যেন-দেখেছিলাম বলে যেন-স্মরণরূপ বোধও জাগ্রৎ অবস্থায় হয়।

জাগ্রদবস্থার তুলনায় স্বপ্নাবস্থা সূক্ষ্মতর। কিন্তু তার চেয়েও সূক্ষ্মাবস্থা আছে, যার নাম নিঃস্বপ্ন সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রা। এই অবস্থায় কোনও কিছু আমরা দেখিনা, কোনও কিছুর জ্ঞান হয় না। অথচ তখন একেবারে কোনও বোধ থাকে না, একথা বলা যায় না। তার প্রথম কারণ এই যে, আমি তো সুষুপ্ত অবস্থায় ফুরিয়ে যাই নি। আগেকার জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তির পরে যে জাগ্রদবস্থা, এ দুয়ের মাঝখানে যে-ভাবেই হোক আমি ছিলাম—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ জাগে না। আর, 'আমি' মানেই মূলে চিদাত্মক জীব (অর্থাৎ ব্যষ্টি আত্মা)। অতএব, সুষুপ্তির আগে এবং পরে, অতএব মাঝখানেও, আমি একই চিদাত্মক জীব। দ্বিতীয়তঃ, সুষুপ্তি ভঙ্গের পরে আমি পরিষ্কার স্মরণ করি আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, এবং তখন কিছুই জানি নি। অর্থাৎ চিদাত্মক আমি ছিলাম এবং একজাতীয় সুখ অনুভব করেছিলাম এবং তদুপরি কিছুই তখন জানি নি—এতগুলি কথা জাগরিত

অবস্থায় স্মরণ করি। সেই ব্যাপারই পরে স্মরণ করা যায় যে ব্যাপার কোনও এক সময় সরাসরি আমি জেনেছিলাম, আমার অভিজ্ঞতায় পেয়েছিলাম। অতএব, সুষুপ্তাবস্থায় আমি নিশ্চয়ই সরাসরি তিনটি ব্যাপার জেনেছিলাম—এক, আমি ছিলাম, অর্থাৎ আত্মা বর্তমান ছিল, দুই, তখন সুখ অনুভব করেছিলাম, এবং তৃতীয়তঃ তখন যে কিছুই জানছিলাম না এ ব্যাপারটাও, অর্থাৎ না-জানা ব্যাপারটাও, তখন যে ভাবেই হোক সরাসরি জানছিলাম। এই না-জানা ব্যাপারটার নামই অজ্ঞান, অপর নাম মায়া। অর্থাৎ, সুষুপ্তাবস্থায় আত্মা অজ্ঞানাবৃত হয়ে ছিল, অথচ এ ব্যাপারটা সে তখন সরাসরি জানতেও পারছিল। এটা আদৌ যে সম্ভব হয় তার একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আত্মা সূর্যের মতন সদা স্বপ্রকাশ। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়লেও তার কিছুটা আলো সর্বদাই ধরা পড়ে। প্রশ্ন থেকে যায়, সুষুপ্তাবস্থায় কার কাছে আত্মা ধরা পড়ে? সূর্য নিজের কাছে সদা পূর্ণপ্রকাশ, তা সে মেঘে ঢাকা পড়ুক বা না পড়ুক। মেঘাবৃত অবস্থায় তার যে স্বল্প প্রকাশ সেটা কেবল আমাদের কাছে, সহজ কথায় আমার মনের কাছে, আমার চিত্তের কাছে। এখন, সুষুপ্তাবস্থায় এই মন বা চিত্ত কোনও কাজ করেনা, সমস্ত কল্পনা প্রত্যাহৃত হয়ে থাকে, চিত্ত একেবারে নিস্পন্দ অবস্থায় বর্তমান থাকে। স্বপ্নজগতের সব কিছুই চিত্তস্পন্দন মাত্র। সুষুপ্ত অবস্থাকালীন নিস্পন্দন চিত্ত আর চিত্তই নয়, কারণ যে চিত্ত কোনও কাজ করছে না তাকে চিত্ত বলার আর কোনও কারণই থাকে না। এই উপসংহৃত চিত্তের নামই অজ্ঞান বা মায়া। সাঙ্খ্য-যোগ দর্শনে একে আত্মভিন্ন, আত্মাতিরিক্ত প্রকৃতি বা প্রধান বলা হয়। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত মতে যেহেতু স্বপ্নাবস্থ চিত্ত ও চিত্তের যাবৎ ব্যাপার, যাবৎ স্পন্দ বা কল্পনা, মিথ্যা, অতএব সুষুপ্তাবস্থাকালীন উপসংহৃত চিত্ত, যারই অপর নাম অজ্ঞান, সেটাও মিথ্যা। মিথ্যার যে সত্য অধিষ্ঠান, যেমন মিথ্যা সর্পের সত্য অধিষ্ঠান রজ্জু, তার সঙ্গে মিথ্যা ব্যাপারটার—যেমন রজ্জুর সঙ্গে মিথ্যা সর্পের—কোনও নিরূপণযোগ্য সম্পর্কে থাকতে পারে না, কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যা। মিথ্যা সত্যের দ্বারা সৃষ্ট নয়, সত্যের কোনও বাস্তব পরিণাম নয়, সত্যের কোনও দোসরই নয়। সত্য ও মিথ্যা মিলে দুটো জিনিষ হয় না। মিথ্যা সত্যকে স্পর্শ করে না, মিথ্যার সঙ্গে সত্যের কোনও প্রকার কার্যকারণসম্পর্ক নেই। স্বপ্নাবস্থায় যে মিথ্যা স্পন্দবান চিত্ত সমস্ত স্বপ্নজাল মিথ্যাভাবে তৈরি করেছিল সুষুপ্তাবস্থায় সেই চিত্ত নিঃস্পন্দ হওয়ার ফলে, নিশ্চিত্ত অজ্ঞান বা মায়ারূপে, অধিষ্ঠান

আত্মার সঙ্গে এক মিথ্যা অনির্বাচ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত থাকে ; অর্থাৎ এই অজ্ঞানের সঙ্গে আত্মার প্রকৃত কোনও সম্পর্ক নেই। কেবল **মনে হয় যেন** এই অজ্ঞান বা মায়া প্রকৃতই আত্মার এক অদ্ভুত শক্তি, যার ফলে স্বপ্নাবস্থায় এই অজ্ঞান চিত্তরূপে কাজ করে, যে-কাজেরই ফল আমার সমগ্র মিথ্যা স্বপ্নজাল।

সাঙ্খ্যযোগের অমিথ্যা প্রকৃতি, পুরুষ বা আত্মার উপস্থিতি মাত্রে, ঐ আত্মাকে সম্মোহিত করে, মিথ্যাজালে জড়িয়ে, নিজের সঙ্গে এক করে নেয়। সাঙ্খ্যযোগ মতে কেবল এই একত্বটা মিথ্যা, কিন্তু পুরুষ সত্য, প্রকৃতিও সত্য, এবং উভয়ের সান্নিধ্য[১] এবং প্রকৃতির স্পন্দ ও পরিণাম সবই সত্য। উভয়ের প্রকৃত সান্নিধ্য বনাম মিথ্যা একত্বের ফলে বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত, এবং তার পরে স্থূল ভূত—এই ক্রমে সত্য প্রকৃতির সত্য পরিণামধারা চলে ; আবার নিবৃত্তিমার্গে বিপরীত ক্রমে প্রকৃতি জট খুলতে খুলতে শেষ পর্যন্ত পুরুষকে মুক্তিও দিতে পারে, মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে দেয়ও। কিন্তু এত কথা বলা সত্ত্বেও সাঙ্খ্যযোগকে এও বলতে হয়েছে যে, কেন প্রকৃতি অনাদি কাল থেকে পুরুষকে বেঁধে রেখেছে তা একেবারেই দুর্নিরূপ্য, যদিও বেঁধে রেখেছে—একথা ঠিক। অদ্বৈতবাদী ঔপনিষদ ঋষিরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন, এই বন্ধন মিথ্যা, বন্ধনজাত সমস্ত তথাকথিত পরিণাম মিথ্যা, প্রকৃতিরূপ শক্তিটাই মিথ্যা, ওটা পুরুষসম্পর্কিত হলেও এক মিথ্যা শক্তি, এবং পুরুষের সঙ্গে ওর সম্পর্কও মিথ্যা, কেবল মনে হয় **যেন** ওটা পুরুষের, অর্থাৎ আত্মার, এক শক্তি।

আরও কথা এই যে, সাঙ্খ্যযোগের পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা, সংখ্যায় একাধিক, অসংখ্য। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের আত্মা সংখ্যায় বহু নন। চিত্ত বহু। সুষুপ্তাবস্থায় এই চিত্ত তার স্পন্দ বা কাজ বন্ধ করলেই আর সে চিত্তরূপে থাকেনা, অতএব তার বহুত্ব লোপ পায়, পিণ্ডীভূত আত্মাবরক মেঘবৎ এক-অজ্ঞান রূপে তখন বর্তমান থাকে। এই এক-অজ্ঞানের নামই মায়া।

১। অনেকে এই 'সান্নিধ্যে'র অর্থ করেছেন 'যোগ্যতা'। কিন্তু তাতে কী ইষ্টসিদ্ধি হল বোঝা যায় না। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে—এই যোগ্যতাটা মিথ্যা কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন—এই যোগ্যতারই আর এক নাম 'শক্তি' নয় কি ? সাঙ্খ্য-যোগ নিশ্চয়ই যোগ্যতা ব্যাপারটা ন্যায়ের মতন বোঝেন না, শক্তি মানতে সাঙ্খ্য-যোগের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সাঙ্খ্যযোগ কি শক্তি মানবেন ? শক্তি মানলে, সে শক্তি কার ? পুরুষের অথবা প্রকৃতির ?

কোনও কোনও অদ্বৈতী বলেন এখনই একে 'এক' অজ্ঞান বলা যাবে না, বলতে হবে বিভিন্ন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন অজ্ঞান, কারণ একজন যখন সুষুপ্ত অন্যেরা তখন সুষুপ্ত নাও থাকতে পারে। সেইজন্য এই ব্যক্তিগত অজ্ঞানকে তাঁরা তুলাবিদ্যা বলেন, মূল অবিদ্যা রূপে পিণ্ডীভূত এক-অজ্ঞান এরও উপরে, তার নাম মূলাবিদ্যা বা মায়া। কিন্তু এ-জাতীয় প্রভেদ টানা যায় কেবল জাগ্রতের দৃষ্টিকোণ থেকেই, হয়তো স্বপ্নদ্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকেও, কারণ স্বপ্নদ্রষ্টাও স্বপ্নে একাধিক ব্যক্তিকে দেখে ও তাদের সঙ্গে আলাপ করে। সুষুপ্তাবস্থায় বহুত্বের কোনই অবকাশ নেই। এই অনবকাশবহুত্বক আবরণরূপ অজ্ঞানকেই সহজ ভাষায় 'এক' অজ্ঞান, অর্থাৎ মায়া, বলা হয়, এবং এই অর্থেই সুষুপ্তাবস্থ আত্মাকেও 'এক' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মায়া বা আত্মা কেউই সংখ্যায় 'এক' নয়, মাত্র অ-বহু। এইজন্যই বলা হয় অদ্বৈত।

মাণ্ডূক্যোপনিষদে এই জন্য সুষুপ্তাবস্থ আত্মাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে ভাগ করা হয় নি। জাগ্রদবস্থ আত্মাকে ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব ও সমষ্টিরূপে বৈশ্বানর বা বিরাট্ বলা হয়েছে, স্বপ্নাবস্থ আত্মাকেও ব্যষ্টিরূপে তৈজস ও সমষ্টিরূপে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বলা হয়েছে।[১] কিন্তু সুষুপ্তাবস্থ আত্মাকে কেবল সমষ্টিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—বলা হয়েছে তিনি ঈশ্বর বা সর্বেশ্বর, যিনি মিথ্যা-মায়াশক্তি-সমন্বিত হয়ে আছেন, যখন খুশি স্বপ্নাবস্থায় বা জাগ্রদবস্থায় ঐ মিথ্যা মায়াশক্তির মিথ্যা বিক্ষেপের সাহায্যে মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। অবশ্য, স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে নিজেও মিথ্যা, তদ্রূপ ঈশ্বরও মিথ্যা মায়াশক্তির মাধ্যমে মিথ্যা জগতের স্রষ্টা হিসাবে নিজেও মিথ্যা, অর্থাৎ এই মিথ্যাজগতের সৃষ্টিরূপ ব্যাপারটাও মিথ্যা। অধিষ্ঠানসত্য সেখানে মায়া-সম্পর্ক-লেশশূন্য ব্রহ্মরূপ শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈততত্ত্ব—আত্মা।

অদ্বৈত বেদান্তমতে মায়াশক্তি নিজেই মিথ্যা, অতএব চিত্ত ও জগৎ-রূপ তার যে বিক্ষেপ বা স্পন্দ তা-ও মিথ্যা, এবং এই মায়াশক্তির সঙ্গে কূটস্থ পরমাত্মার সম্পর্ক ও ঐ সম্পর্কে সম্পর্কিত রূপে পরমাত্মাও—অর্থাৎ যাঁর

১। খাস মাণ্ডূক্যোপনিষদে অবশ্য জাগদ্রবস্থ আত্মাকে কেবল সমষ্টিরূপে বৈশ্বানর এবং স্বপ্নাবস্থ আত্মাকে কেবল ব্যষ্টিরূপে তৈজস বলা হয়েছে। কিন্তু মাণ্ডূক্যকারিকায় এবং শাঙ্কর ভাষ্যে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে আথেরে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভেদ বিবক্ষায় কখনও আত্মাকে ব্যষ্টিরূপে, কখনও, সমষ্টিরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

নাম ঈশ্বর তিনিও—মিথ্যা। একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্ব হল কূটস্থ আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। সেটা হল এই যে, একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তী ছাড়া আর কোন দার্শনিকই এই মতবাদী নন। সাঙ্খ্যযোগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অদ্বৈতবাদী শৈব দার্শনিক কূটস্থ ব্রহ্ম বা শিবকে যতখানি সত্য মনে করেন তাঁর আদি শক্তিকেও—তার নাম মায়াই হোক বা অন্য যাই হোক—ঠিক ততখানি সত্য মনে করেন। উভয়ের সম্পর্ক অবশ্যই অনির্বাচ্য, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই শক্তিই স্বয়ং বাক্, কাজেই কূটস্থ আত্মমগ্ন শিব ও এই শিবের সঙ্গে শক্তির যে সম্পর্ক তা অবশ্যই বাক্যের অতীত, এবং এই অর্থেই অনির্বাচ্য; এই অনির্বাচ্যত্ব মিথ্যার সমপর্যায়ী নয়। এই সম্পর্ক একত্ব ও দ্বিত্বের অতীত, অথচ উভয়ের অনিষেধক এক অপরূপ সম্পর্ক—নাম সামরস্য, যে-জাতীয় সম্পর্ক লৌকিক জগতে যে-কোনও শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে থাকে, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মধ্যে। দাহিকা শক্তি মিথ্যা, দাহিকা শক্তির সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক মিথ্যা, দাহিকাশক্তিবিহীন অগ্নিস্বরূপমাত্র সত্য, এ-কথা বলা যায় না; বলতে হয় দাহিকা শক্তির সহিত সমরস অগ্নি—এই তথাকথিত দুই-এর মিলনে যে concrete, মূর্ত, একত্ব তাও ঠিক তেমনই সত্য, তেমনই মাহাত্ম্যপূর্ণ, যেমনটি অগ্নি নিজে অথবা দাহিকাশক্তি নিজে। তদ্রূপ শিব ও শক্তির সম্পর্ক। প্রভেদ এই যে, শক্তিবিহীন কূটস্থ শিব প্রায় contentless হয়েও স্থিতিস্বরূপ, এবং শিববিযুক্ত শক্তি স্থিতিহীন, চিরচঞ্চল, বিশ্বজগতের যাবৎ content এর সূক্ষ্মতম অবস্থা—the great indefinite dynamism.

অবশ্য, সব শৈবদার্শনিক একই কথা বলেন নি। অনেকের মতে স্বস্থ শিব-স্বরূপ ছাড়া যে চিরচঞ্চল শক্তির কথা বলা হয়েছে সেই শক্তি শিবের সহিত সমরস (একাত্ম)। অর্থাৎ, ঐ অবস্থায় বিশ্বজগতের যাবৎ content সূক্ষ্মতম রূপে যেমন মূল শক্তিতে সদা বর্তমান তদ্রূপ মূল শিবেও সদা বর্তমান। এরই নাম অক্ষুব্ধ শিবশক্তিসামরস্য, এর উর্ধ্বে আছে অনুত্তর কেবল-শিব, কারো কারো মতে অনুত্তরা শক্তিও। এবং এর নিচে আছে শিবাশ্রিতা ক্ষুব্ধা শক্তি যার ক্রমিক রূপ হচ্ছে জ্ঞান ও ক্রিয়া। পরে এ-বিষয়ে আলোচনা হবে। দ্বৈতবাদী শৈবের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

অপর দিকে, মহাযানী বৌদ্ধেরা এবং উগ্রপন্থী শাক্তেরা শিব ও শক্তির মধ্যে, স্থিতি ও গতির মধ্যে, অদ্বৈত-বেদান্তীর মতন মাত্র একটিকেই চরম তত্ত্ব বলে মেনেছেন এবং অপরটি নস্যাৎ বা প্রায়নস্যাৎ করেছেন। উগ্রপন্থী

শাক্তের কাছে শক্তিই সর্বমহিমান্বিতা, কেবল স্থিতিলাভের জন্য তাঁর শিবের প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানবাদীদের বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অদ্বৈতী-বেদান্তীর চিন্মাত্র ব্রহ্মের সদৃশ হয়েও মূলে একান্ত বিসদৃশ, কারণ, সর্বতোভাবে indefinite, অনির্দেশ্য —কেবল বাক্যের দ্বারা অনির্দেশ্য নয়, স্বরূপতঃও অনির্দেশ্য, যে-কথা অদ্বৈত-বেদান্তীর ব্রহ্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মাধ্যমিক বৌদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব 'ন সৎ নাসৎ ন সদসৎ ন নিঃসদসৎ', এইরূপে চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত একান্ত অনির্দেশ্য, একান্ত স্থিতিহীন, কেবল dynamism.

মাণ্ডূক্যোপনিষদে সুষুপ্তিরও অতীত যে তুরীয় অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেই অবস্থায় একমাত্র নিষ্কল কূটস্থ আত্মাই বর্তমান। তুরীয়ে সর্বমিথ্যার **অবসান** ( অমুক অমুক ব্যাপার মিথ্যা, এরূপ বোধও নেই )। তুরীয় অবস্থায় মায়া বা অজ্ঞান নেই, অজ্ঞানের চিত্তরূপ পরিণাম নেই, চিত্তের স্বপ্নরূপ স্পন্দ বা বিক্ষেপ নেই[১]। বাহ্য জগৎ ও তার আনুষঙ্গিক কিছুই নেই। থাকে কেবল কূটস্থ কেবলী আত্মা, ব্রহ্ম—অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত আত্মৈব, নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চো-পশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থম্। স আত্মা।

পূর্বেই বলা হয়েছে ওঁকারের তথাকথিত চতুর্থ মাত্রা যেমন মাত্রাই নয়, সর্বমাত্রার অতীত সমগ্র ওঁকার, তদ্রূপ আত্মার তথাকথিত এই চতুর্থ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অবস্থাবিশেষ বা পাদবিশেষ বা কলা-বা-অংশবিশেষ নয়। তুরীয় সর্ব অবস্থার অতীত বা সর্বাবস্থ সমগ্র। 'ইহ নানাস্তি কিঞ্চন' ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' একই কথা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় লভ্য যা কিছু সবই প্রকৃতপক্ষে ঐ 'ব্রহ্মৈব', কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর যা-কিছু সবই মিথ্যা, প্রতি উর্ধ্বতর অবস্থায় নিম্নতর অবস্থালব্ধ যা-কিছু দ্বৈত, নানা পদার্থ, সবই আপাততঃ নিঃশেষে মুছে যায়, কেবল সুষুপ্তি অবস্থা পর্যন্ত সংস্কার বা মূলীভূত অজ্ঞান থেকে যায় বলে পরিত্যক্ত অবস্থাগুলিতে পুনরাবর্তন সম্ভব হয়। কিন্তু তুরীয়ে একবার পৌঁছাতে পারলে আর প্রত্যাবর্তনের অবকাশ

[১] অবশ্য চিত্তরূপ পরিণাম ও স্বপ্নরূপ বিক্ষেপ একই সঙ্গে হয়, কারণ স্পন্দবিহীন, বিক্ষেপবিহীন, অর্থাৎ কাজ করছে না এমন, চিত্তই থাকতে পারে না। যোগবলে বা যেভাবেই হোক, চিত্ত নিষ্ক্রিয় হলেই পিণ্ডীভূত, মূলীভূত, অজ্ঞানে পুনঃ বিপরিণত হয়।

থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তুরীয়ে পৌছাতে হয় না। সর্বাবস্থাতেই তুরীয় আবৃত ভাবে বর্তমান। ঐ আবরকের বিভিন্ন বিক্ষেপবশতঃ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় তুরীয়ের কোনও প্রকৃষ্ট বোধ থাকে না, সত্য। কিন্তু তুরীয় সদা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান। তুরীয়ে পৌছালাম বা পৌছাতে হবে বলে যে-কথা বলা হয় তার প্রকৃত অর্থ এই যে, সর্ব বিক্ষেপের উপসংহার হয়েছে বা হবে এবং তার পর মূল আবরক অজ্ঞানের অপসারণ হয়েছে বা হবে। সদাপ্রকাশমান সূর্য যেমন মেঘাপসারণে নতুন প্রকাশ লাভ করে না, সদাস্বপ্রকাশ আত্মাও সেইরূপ অজ্ঞানাপসারণে নতুন করে প্রকাশিত হয় না। দিবাভাগে মেঘাপসারণের অর্থই যেমন প্রকাশমান সূর্য, তদ্রূপ মায়াপসারণের অর্থই স্বপ্রকাশ আত্মা। অন্যভাবে আবার বলা যায়, আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি ও টাকার মধ্যে যে সম্পর্ক, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়ের মধ্যে ঠিক সেই সম্পর্ক। টাকারূপ মুদ্রার পূর্ণ মূল্য একটাকাই; আট আনা চার আনা, দু-আনা ও এক আনা ঐ মূল্যের অংশ বিশেষ; নিম্নতম অংশটি বৃদ্ধি লাভ করতে করতেই একটাকা-রূপ মূল্যে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ একটাকা মূল্য একটাকা মূল্যের অংশবিশেষ নয়, ওটাই হল সামগ্রিক এক টাকা। শৈবদর্শনে এরই নাম পূর্ণকল=নিষ্কল=সকলনিষ্কল।

স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় প্রসঙ্গে স্বয়ং মাণ্ডূক্যোনিষদের ঋষি, এবং মাণ্ডুক্য-কারিকাকার গৌড়পাদ ও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এমন কয়েকটি অদ্ভুত কথা বলেছেন যা বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য। মাণ্ডূক্যোপনিষদে বলা হয়েছে সুষুপ্তি অবস্থা আনন্দময় এবং ঐ অবস্থায় আত্মা আনন্দভুক্, পক্ষান্তরে স্বপ্ন (ও জাগ্রৎ অবস্থায়) আনন্দ ও দুঃখ দুই-ই থাকে (দুঃখের ভাগই বেশি), এবং তুরীয় অবস্থায় আত্মা 'শান্তং' এবং 'শিবম্'। সুষুপ্তি-অবস্থাকালীন যে 'আনন্দ' (গৌড়পাদ ও শঙ্করের ভাষায় 'সুখ') এবং তুরীয় অবস্থাকালীন যে 'শান্তি'—এদের মধ্যে প্রভেদ কী? যদি বলা হয়, শান্তির অর্থ দুঃখাবসান, দুঃখের পূর্ণ উপশম মাত্র, তাহলে অবশ্য সুষুপ্তিকালীন সুখের সঙ্গে এর পার্থক্য বোঝা যায়। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতমতে (শঙ্করের বেদান্তমতে যে কথা অতি পরিস্ফুট) কূটস্থাবস্থায় আত্মা সৎ চিৎ এবং আনন্দ-স্বরূপ। তা হলে এই আনন্দ এবং সুষুপ্তি-কালীন আনন্দের মধ্যে প্রভেদ কী? শঙ্কর বলেছেন, সুষুপ্তিকালীন আনন্দ তামসিক আনন্দ—কিছু-না-করা, কিছু-না-জানার আলস্যজনিত যে ঘোলাটে আনন্দ তাই; যেমন ঘনঘোর বর্ষায় বাদলা হাওয়ায় গাঢ় ঘুমের পর লোকে বলে "কি রকম ঘোলাটে

আনন্দে গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছিলাম”। সুষুপ্তির আনন্দ এই রকম 'ঘোলাটে ধরনের'—অর্থাৎ তামসিক প্রকৃতির—হতে পারে বলেই যোগভাষ্যকার ব্যাস তিনজাতীয় সুষুপ্তির কথা বলেছেন—সুখমহমস্বাপ্সম্, দুঃখমহমস্বাপ্স্যম্, গাঢ়ম হমস্বাপ্স্যম্। যাই হোক, শঙ্করের মতে সুষুপ্তির এই ঘোলাটে আনন্দের তুলনায় তুরীয় অবস্থার আনন্দ হল একেবারে নিষ্কলুষ, নির্মল, স্বচ্ছ, জ্ঞানসঞ্চারী —প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম, যারই নাম মাণ্ডুক্যোপনিষদে দেওয়া হয়েছে 'শান্তম্' অর্থাৎ শান্তি। কিন্তু শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই কথা বললেও কারিকাতে কোথাও এই পার্থক্যের উল্লেখ নেই। সেখানে 'শান্তি' শব্দের অর্থ উপশান্তিই, অর্থাৎ ঐকান্তিক উপশম। গৌড়পাদ বলছেন, কূটস্থ আত্মাকে 'এক' বলার প্রকৃত অর্থ যেমন দ্বৈতনিষেধ মাত্র—অর্থাৎ আত্মা নানা নন, আত্মা বহু জীব নন, আত্মা জগতের নানা দৃশ্য বিষয় নন, এই কথা বলা; যেমন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনায় ব্যাবহারিক জগতের ভাষায় 'অমুক নয়', 'অমুক নয়,' এই প্রকারে নেতি নেতি পথে অগ্রসর হতে হয়, সেইরূপে সুখস্বরূপ আত্মার বর্ণনাকালে বলতে হয় প্রকৃত আত্মাপলব্ধিতে সর্ব দুঃখের শান্তি, অর্থাৎ উপশম, হয়। যাই হোক, কারিকাতে সমস্ত ব্যাপারটা এই ভাবে নেতি মুখে বলা হলেও শঙ্করের সঙ্গে কারিকাকারের মূলতঃ কোন বিরোধ নাও থাকতে পারে।[১] অনেকের মতে কারিকাকার গৌড়পাদ মহাযানী বৌদ্ধ, অন্ততঃ অনেকাংশে মহাযানী মতাবলম্বী। এ বিষয়ে তথাকথিত প্রমাণের মধ্যে অনেকে এই দুঃখোপশমের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন মুক্তি বা নির্বাণ অবস্থায় সুখের পরিবর্তে দুঃখোপশমের কথা বলে গৌড়পাদ তো বৌদ্ধপ্রীতিই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথা যে ঠিক নাও হতে পারে তা তো আমরা এখনই দেখলাম। তা ছাড়া, উপনিষদে এবং প্রচলিত অদ্বৈত বেদান্তে কি আনন্দময় 'কোশে'র কথা বলা হয় নি? অন্নময় প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের মত আনন্দময় কোশও আত্মার একজাতীয় 'কোশ' বা আবরণ, যদিও এই শেষ আবরণটি স্বচ্ছতম, প্রায় আত্মার স্বরূপস্পর্শী। স্বরূপতঃ আত্মা কিন্তু এই কোশেরও অতীত। অর্থাৎ, যে-আনন্দকে আত্মার স্বচ্ছতম কোশ বলা হয়েছে সেটা এখনও নিষ্কল নয়—জাগতিক দুঃখের ক্রমক্ষীয়মাণতার

১। আবার, লক্ষণার দ্বারা শঙ্করের 'তামসিক' আনন্দের অর্থ এই করা যেতে পারে যে, এই আনন্দ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের পর্যায়ে পড়ে, এবং তদ্বৈপরীত্যে তুরীয়ের 'পর্যাপ্ত' একেবারে নির্গুণ।

শেষ সীমায়, অথচ সম্পূর্ণ শান্ত নয়; ভাবমুখে বলা যায়, জাগতিক সুখের ক্রমবর্ধমানতার শেষ সীমায়, অথচ পরিপূর্ণ (perfect) নয়। সুখকলাবৃদ্ধির এই ঈষদূনশেষসীমা পর্যন্ত আত্মা সকল, কিন্তু একেবারে পরিপূর্ণ (perfect) অবস্থায় সর্বকলাবান হয়েও, অর্থাৎ পরিপূর্ণকল হয়েও, আত্মা নিষ্কলও বটে। দুঃখের অভাব রূপে এই তুরীয়াবস্থ আত্মা নিশ্চয়ই দুঃখের চরম উপশম—অর্থাৎ পরম শান্তি। কিন্তু গৌড়পাদ স্পষ্ট ভাবে না বললেও প্রচলিত অদ্বৈত বেদান্ত পক্ষে বলা অসঙ্গত হবে না যে, ভাবমুখে এই শান্তিই পরিপূর্ণ (সকল-) নিষ্কল আনন্দস্বরূপ। যে কথা 'আনন্দে'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা 'সৎ' ও 'চিৎ'-এর ক্ষেত্রেও সম ভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তুরীয়ে একদিক দিয়ে যেমন অসত্তা ও অচিতের পরম নিবৃত্তি তদ্রূপ সত্তা ও চিতের পরিপূর্ণতা (সকল-নিষ্কলতা)। প্রচলিত অদ্বৈতবেদান্তে এই ভাবেই তুরীয়ের সচ্চিদানন্দত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দেখান হয়েছে একমাত্র এই পথেই সৎ চিৎ ও আনন্দের ত্রিতয়ত্ব দোষ থেকে অদ্বৈতবাদীর পক্ষে উদ্ধার লাভ সম্ভব। যদেব সৎ তদেব চিৎ স এব আনন্দ—এই সত্য অন্য কোনও ভাবে উপপন্ন হয় না।

আচার্য শঙ্কর কেন যে সুষুপ্তিকালীন আনন্দকে মলিন তামসিক আনন্দ বললেন তা বোঝা দুষ্কর। বিবরণ কিংবা ভামতী প্রস্থানের কোন গ্রন্থেই এমন কথা বলা নেই। আনন্দময় 'কোশে'র উল্লেখ অনেক গ্রন্থেই আছে, সত্য; কিন্তু তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপও যে আনন্দ এ-কথা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে, এবং অন্য কোথাও আনন্দময়কোশ রূপ আনন্দকে মলিন বা তামসিক বলা হয়েছে বলে জানা নেই। মনে হয়, কারিকাকার গৌড়পাদ যে মহাযানী বৌদ্ধ নন এই মতবাদ স্থাপনে কারিকাভাষ্যকার শঙ্কর এখানে একটু বেশি মাত্রায় সচেষ্ট হয়েছেন; এবং তাঁর এই সজ্ঞানচেষ্টাই আবার নিরপেক্ষ পাঠকের মনে প্রবল সন্দেহ জাগিয়ে তোলে যে মাণ্ডুক্যকারিকাকার গৌড়পাদ সম্ভবতঃ মহাযানী বৌদ্ধই ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে, অবশ্যই বহুস্থলে গৌড়পাদ এমন সব বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি হিন্দুদর্শনে প্রায় কখনই ব্যবহৃত হয় না; বিশেষ করে তাঁর 'ধর্ম'[১] শব্দটির ব্যবহার নিঃসন্দেহে বড়ই বিভ্রান্তিকর, যার জন্য স্বয়ং শঙ্করাচার্যকে বিভিন্ন স্থলে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ

১। তদ্রূপ চতুর্থ প্রকরণে একাশী সংখ্যক কারিকায় 'ধাতু' শব্দের প্রয়োগ-ও বিভ্রান্তিকর মনে হয়।

করতে হয়েছে; 'বুদ্ধ' বা 'বৌদ্ধ' শব্দটি কারিকাকার বহুবার এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে প্রথম পাঠে মনে হয় তিনি ভগবান বুদ্ধকে অথবা বৌদ্ধমতাবলম্বীকে নির্দেশ করছেন; চতুর্থ প্রকরণের নিরানব্বই সংখ্যক কারিকায় তিনি তো খোলাখুলি বুদ্ধদেবকে স্মরণ করেই লিখেছেন যে, কারিকায় বর্ণিত তাঁর মতবাদ বুদ্ধের মতবাদ নয়। শঙ্করাচার্য কর্তৃক এই 'বুদ্ধ' ও 'ধর্ম' শব্দ দুটি পরস্পর সন্নিহিত বিভিন্ন কারিকায় বিভিন্ন অর্থে বোঝাবার চেষ্টা পক্ষপাতহীন পাঠকের মনে অবশ্যই সন্দেহের উদ্রেক করে। তা ছাড়া, কারিকার চতুর্থ প্রকরণস্থ ছিয়াশী ও সাতাশী সংখ্যক কারিকা দুটিতে তিনি যে ভাবে চরমতত্ত্ব ( যাকে তিনি অন্যত্র 'নির্বাণ' শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত করেছেন ) সম্বন্ধে খোলাখুলি বলেছেন যে, তত্ত্বটি সৎ, অসৎ, সদসৎ ও নিঃসদসৎ— এই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত, তাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁকে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলে মেনে নিতে দ্বিধা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ ছাড়াও, চতুর্থ প্রকরণে তিনি যে 'অস্পর্শযোগের' কথা লিখেছেন অতি সহজেই তাতে মাধ্যমিকের 'অপ্রণিধান যোগের' বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

বড় বড় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু গৌড়পাদের নিজের কথা থেকেই, বিশেষ করে চতুর্থ প্রকরণের নিরানব্বই সংখ্যক কারিকা থেকে, স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর মত বুদ্ধদেবের—অর্থাৎ বৌদ্ধদের মত থেকে ভিন্ন।[১] দুঃখশান্তি কথাটা নেতিমুখে সুখস্বরূপেরই বর্ণন—এ ব্যাপারটা বুঝলে তাঁকে আর বৌদ্ধ বলতে ইচ্ছা করে না। চরমতত্ত্বের চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত হওয়া ব্যাপারটাও ঐ ভাবে নেতিমুখে বুঝলে তাঁকে অদ্বৈতবেদান্তী বলতে বাধা কোথায়? 'অস্তি', 'নাস্তি', 'অস্তিনাস্তি' এবং 'অস্তিও নয় নাস্তিও নয়'—এই চারটি বিকল্পই তো জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জগতের ব্যাপার। স্বরূপে চরমতত্ত্বকে এই তিন জগতের কোনও ভাষায় ইতিমুখে বোঝা যাবে না, গৌড়পাদ ঐ কারিকাতে হয়তো এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর অস্পর্শযোগকেও যদি সহজভাবে বিষয় থেকে সরে আসা যোগ, practice of detachment, বলে বুঝি, তাহলে তাঁর বৈদান্তিকতা ক্ষুণ্ণ হয় কী ভাবে?

১। অন্যনিরপেক্ষ ভাবে এটা কিন্তু একটা বড় কথা নয়। উপনিষদ ব্যাখ্যার সময় খাঁটি বুদ্ধমত অযুক্তিযুক্ত হলেও ব্যাখ্যাকার অতি সহজে আধাবৌদ্ধ মত, অর্থাৎ বুদ্ধমতের কাছাকাছি কোনও মতের সাহায্য নিয়ে থাকতে পারেন।

অবশ্য, 'ধর্ম' শব্দ, 'ধাতু' শব্দ এবং অন্যান্য বহু বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, আচার্য শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদের সময়ে বৌদ্ধধর্মের ক্ষয় ভাল ভাবে সুরু হলেও প্রায় সহস্রবর্ষস্থায়ী প্রবলপ্রতাপান্বিত বৌদ্ধজ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা তখনও (এমন কি শঙ্করের সময়েও এবং তার পরেও) পণ্ডিত সমাজে (হয়তো বা সাধারণ্যেও) সুপ্রচল ছিল। এমনও হতে পারে যে, গৌড়পাদ সেই ভাষাতেই অনেকস্থলে তাঁর অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। দর্শন আলোচনাকালে আমরাও কি বর্তমানে পাশ্চাত্য চিন্তাভঙ্গী ও পারিভাষিক শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করি না? তাছাড়া, প্রভাববান সুপ্রচল কোনও মতবাদ খণ্ডন করতে হলেও তো অনেক সময় সেই মতবাদীর চিন্তাভঙ্গী ও ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ অন্ততঃ 'আহার্য' ন্যায়েও ব্যবহার করতে হয়। আরও কথা এই যে, অলাতশান্তি নামক চতুর্থ প্রকরণে গৌড়পাদের বিচার-পদ্ধতিই একটু নতুন ধরনের। অদ্বৈত বেদান্ত ভিন্ন অন্য যাবৎ মতবাদ তিনি প্রায়ই খণ্ডন করিয়েছেন একটিকে অপরের দ্বারা। এ-জাতীয় পারস্পরিক খণ্ডনে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মুখ দিয়ে যতদূর সম্ভব তাদের ভাষায় তাদের কথা প্রকাশ করাই তো যুক্তিযুক্ত। অতএব, যদি বাদী বা প্রতিবাদী বৌদ্ধের ভাষাতেই তাঁদের বক্তব্য গৌড়পাদ লিপিবদ্ধ করে থাকেন তা থেকে প্রতিপন্ন হয় না যে তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী, অথবা বৌদ্ধমতবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিজ্ঞানবাদের দ্বারা বস্তুবাদ খণ্ডন করিয়ে তিনি তো পরে বিজ্ঞানবাদের দোষও দেখিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, গৌড়পাদের পূর্বে অজাতিবাদ রূপ অদ্বৈত দর্শন, (যে-দর্শন আচার্য শঙ্কর ভারতীয় দার্শনিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন) এদেশে কুত্রাপি ছিল কি না সন্দেহ। ভারতীয় দর্শনের সাহিত্যে গৌড়পাদের পূর্বে কোথাও এজাতীয় অদ্বৈতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব গৌড়পাদই এর প্রতিষ্ঠাতা। আনন্দগিরি লিখেছেন, বদরিকাশ্রমে নররূপী নারায়ণের কাছ থেকে তিনি সরাসরি এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। আর এই মতবাদ ও মহাযান মতবাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ মহান পার্থক্য ঠিক কোথায় তা তো আমরা কিছু পূর্বেই দেখিয়েছি। অতএব, অজাতিবাদরূপ অদ্বৈত-দর্শনকে কেউ যদি মহাযানদর্শনের প্রকারভেদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বলে মনে করেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। হয়তো অন্যায়ও খুব বেশি হবে না। আমাদের বক্তব্য শুধু একটুকু যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম

হলেও অতি কঠোর। সূক্ষ্ম বলে এই পার্থক্য অনেকের নজরে পড়ে না, কিন্তু একবার নজরে পড়লে এদের পারম্পরিক ভেদ যে কতখানি গভীর তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। আবার, এই গভীর পার্থক্য ধরতে না পারার জন্য অনেক অদ্বৈত-বেদান্তী, এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্য হিন্দু দার্শনিকের অনেকেই, বিজ্ঞানবাদ ও মাধ্যমিক দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতেও পশ্চাৎপদ হন নি।

## দ্বিতীয় সমীক্ষা

অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে বিচারমুখে সুষুপ্তি ও স্বপ্ন সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। সুষুপ্তি সম্বন্ধে একটা অকিঞ্চিৎকর প্রশ্ন প্রায়ই তোলা হয়। প্রশ্নট হল, সত্যই কি সুষুপ্তিরূপ কোনও অবস্থা আছে? প্রশ্নটি অকিঞ্চিৎকর দুই কারণে। প্রথম, প্রশ্নকারী ও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্য অনেকেও যদি বলেন যে সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা তাঁদের কখনও হয় নি তাতে কিছুই আসে যায় না। আরও অনেকে তো বলেছেন তাঁদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের নানা দার্শনিক গ্রন্থে এই অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়েছে। কাজেই আমার এ-অভিজ্ঞতা হয় নি, এই অজুহাতে একে প্রথম থেকেই নস্যাৎ করে দেওয়া চলে না। কল্পনাও তো করে নেওয়া যায় তাঁরা কী জাতীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ দিচ্ছেন। প্রতিপক্ষী অন্তত: সেই বিশ্লেষণের দোষগুণ বিচার করে দেখাতে পারেন যে, এ-জাতীয় কোনও অভিজ্ঞতা হতেই পারে না, অথবা পূর্বপক্ষী সুষুপ্তি বলে যে-জিনিষটা খাড়া করছেন সেটি অন্য কোনও অভিজ্ঞতা; অথবা মূলত অন্য অভিজ্ঞতা, কেবল তার সঙ্গে অন্য অনেক কিছুর জোড়াতালি লাগিয়ে তাকে কল্পিত সুষুপ্তির আকারে চালান হচ্ছে। এই হল উপরিউক্ত দুই কারণের মধ্যে প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাঁরাই সুষুপ্তি বিশ্লেষণের উপর বেশি ভরংভর করেছেন তাঁরা সুষুপ্তির অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রথম অপ্রাকৃত (transcendental) অভিজ্ঞতার, অন্তত: প্রাকৃত-অতিক্রান্তর, সন্ধান পেয়েছেন; অর্থাৎ, তাঁদের বক্তব্য, সুষুপ্তি অন্তত: কিছুটা অংশে অপ্রাকৃত ব্যাপার। এই অপ্রাকৃতের উপর যাঁদের আস্থা নেই, অথবা যাঁরা কোথাও অপ্রাকৃতের সন্ধান পান না অথবা দেখেও দেখেন না, স্বভাবতঃই তাঁরা জানতেই পারেন না তাঁদের সুষুপ্তি হয়েছে কিনা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য অনুমান প্রমাণের (inference-এর) ভিত্তিতে সুষুপ্তি হয়েছিল বলে স্বীকার করেন। কিন্তু সেই সুষুপ্তির

মধ্যে তাঁরা এমন কিছু অভিনবত্ব খুঁজে পান না যার ভিত্তিতে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হতে পারে, অথবা পদার্থ-বিচার-শাস্ত্রে ( দর্শনশাস্ত্রে ) বিরাট কোনও আলোড়ন ঘটতে পারে।

নৈয়ায়িকেরা এই শেষোক্ত দলে পড়েন। অনুমান প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁরা অবশ্যই সুষুপ্তি স্বীকার করেন, যে-সুষুপ্তির আকার হল "আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু কোনও স্বপ্ন দেখিনি—কিছুই জানি নি।" "ঘুমিয়ে ছিলাম" বাক্যটির অর্থ হল "বেঁচে ছিলাম অথচ কোনও জ্ঞান ছিল না"। বেঁচে যে ছিলাম তার প্রমাণ হল জেগে উঠে আমার জীবনটাকে সুষুপ্তির পূর্বেকার জীবনের সঙ্গে সহজেই একটানা ভাবে যুক্ত করে নিই, যেমন করি কিছুক্ষণ স্বপ্ন দেখার পরেও। তখন যে কোনও জ্ঞান ছিল না তারও প্রমাণ এই যে, জ্ঞান থাকলে, এবং যেহেতু জাগ্রদবস্থায় তৎস্মরণে কোনও বাধা নেই অতএব, সহজেই আমি ঐ জ্ঞানের বিষয় স্মরণ করতে পারতাম, অবস্থা-বিশেষে ঐ জ্ঞানটিও স্মরণ বা retrospect করতে পারতাম। কিন্তু সুষুপ্তিভঙ্গের পরে ঐ জ্ঞান বা বিষয়, কোনটাই স্মরণে আসে না। তবে যে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন সুষুপ্তিভঙ্গের পরে আমরা ওটা—অর্থাৎ কোনও জ্ঞান না হওয়া ব্যাপারটা, যারই অপর নাম 'কোনও ( জ্ঞাত ) বিষয় না থাকা'—স্মরণ করি সেটা কী করে হয়? উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে ওটা স্মরণ নয়, আমরা অনুমান (infer) করি মাত্র যে, সুষুপ্তি কালে আমি কিছুই জানি নি, অর্থাৎ তখন আমার কোনও জ্ঞান ছিল না।

এখন প্রশ্ন এই—সুষুপ্তিভঙ্গের **ঠিক পরক্ষণেই** যদি বলতে পারি যে আমি এতক্ষণ ( অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে ) কিছুই জানি নি, তাহলে কি এই পরবর্তী অনুভবকে অনুমান, অর্থাৎ যৌক্তিক জ্ঞান, বলা উচিত? অনুমান করতে হলে প্রয়োজন হয় পক্ষজ্ঞান, সাধ্যজ্ঞান, হেতুজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান ইত্যাদি—এবং পরার্থানুমানে আরও অনেক কিছু। সুষুপ্তিভঙ্গের পরে এবং 'আমি এতক্ষণ কিছু জানি নি' এই জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কি এতগুলি অন্য জ্ঞান ঘটবার অবকাশ ছিল? সত্য বটে, নৈয়ায়িক—বিশেষ করে, নব্যেরা—চকিত অনুমান ( instant inference ) খোলাখুলি স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বীকারের মনস্তাত্ত্বিক ( phychological ) যৌক্তিকতা তাঁরা দেখান নি। তাঁরা বড়জোর এই কথা বলতে পারেন, অপরকে বোঝাতে গেলে—অর্থাৎ, ব্যাপারটিকে সকলের সম্মতি লাভের যোগ্য করতে হলে—অনুমানাকারে ব্যাপারটি সাজাতেই হবে। উত্তম কথা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমার অনুভবটি কী জাতীয় ছিল—

প্রত্যক্ষ না অনুমিতি? নব্য নৈয়ায়িক হয়তো বলবেন যে, এ-জাতীয় নিছক মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন যুক্তিনির্ভর দর্শনশাস্ত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে যাঁরা সুষুপ্তির অপ্রাকৃত বা প্রায়-অপ্রাকৃত অভিনবত্ব স্বীকার করেন সেই বৈদান্তিক, সাঙ্খ্যযোগী প্রভৃতি দার্শনিকেরা উত্তর দেবেন যে, দর্শনশাস্ত্রে 'অনুভব'ই হল আসল নির্ভরস্থল। এই অনুভব যখন অনুমানাকার তখনও সেটার অনুব্যবসায় (introspection) রূপ অনুভব হতে পারে। অনেক সময় অনুমানের প্রতি ধাপের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা প্রতিটির পরক্ষণেই, এই অনুব্যবসায় সত্যসত্যই ঘটে। অনেক সময়ে ঘটেনা, এটাও ঠিক। কিন্তু যে-খেলা মানুষের 'পশু' জীবনে আপনাআপনি ঘটে তাকে সজ্ঞান করে তোলাটাই কি তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় নয়? অনুভব-নিরপেক্ষ তত্ত্ববিচার-রূপ একজাতীয় বৌদ্ধব্যায়ামকেও অনেক সময় 'দর্শনশাস্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়। এ-জাতীয় একপ্রকার দর্শনশাস্ত্র নিশ্চয়ই গড়ে উঠতে পারে। প্রচলিত বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের শেষ পর্যায়ে এটাই দর্শনের আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল, এ-কথাও সত্য। কিন্তু যাঁরা এ-জাতীয় বৌদ্ধব্যায়ামরূপ যুক্তিবিদ্যাকে পদার্থবিচারের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করেন, যাঁদের কাছে প্রাথমিক বা অনুব্যবসায়-রূপ অনুভব কেবল উপাত্ত (data) সংগ্রহের পন্থামাত্র, যে-উপাত্তসমূহকে নীরস যুক্তির খুঁটিনাটি নিয়মাবলীর (যারই নাম বৌদ্ধিক ব্যায়াম) সাহায্যে (যৌক্তিক) শোধনান্তে পরস্পর সম্বদ্ধ করে যৌক্তিক সাজে সজ্জিত করার নামই দর্শনরূপ পদার্থতত্ত্বজ্ঞান, তাঁদের বিরুদ্ধে 'আমাদের দার্শনিকদের' বক্তব্য নিম্নরূপ:

আমরা প্রাথমিক বা অনুব্যবসায়রূপ অনুভবকেই পদার্থতত্ত্বজ্ঞান রূপ দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উপায় বলে মনে করি। যুক্তি বা যৌক্তিক নিয়মাবলীর অবশ্যই প্রয়োজন আছে—এর দ্বারাই খণ্ডন মণ্ডন-শোধনাদি হয় এবং অনুভব ও অনুভবলব্ধ পদার্থগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ সুষ্ঠু ভাবে স্থাপিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধিক ব্যায়াম যে একমাত্র—এমন কি প্রধান—মাপকাঠি নয় তার সুস্পষ্ট কারণ এই যে (১) এ-জাতীয় খণ্ডনমণ্ডনের অবসান নেই। প্রতিপক্ষীও সর্বদাই নতুন করে খণ্ডন মণ্ডন করে চলেন। যখন তিনি অপরের প্রতিপাদ্য গ্রহণ করেন সে-গ্রহণ অপরের যুক্তিতর্কের খাতিরে ততটা নয় যতটা যে-ভাবেই হোক (ঐ যুক্তিতর্কের ফলেও হতে পারে) তাঁর নিজেরই অনুভবের তদনুকূল পরিবর্তন ঘটে যায় বলে। যতক্ষণ ঐ-জাতীয় পরিবর্তন না ঘটে ততক্ষণ তিনি ঐ একই ব্যায়ামকৌশলে প্রতিপক্ষীর বিরুদ্ধে নিজমতের মণ্ডন ও প্রতিপক্ষীর মতের খণ্ডন করে যান। তেমন জোরাল অনুভবী হলে তিনি এমন কি নিজপক্ষমণ্ডন ও প্রতিপক্ষ খণ্ডনের

জন্ম নতুন ব্যায়ামকৌশলই উদ্ভাবন করে বসেন। চিন্তাজগতের ইতিহাসে নতুন নতুন Logic সৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নতুন দুই প্রকার Logic সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে আবার বেদান্তীদের (বিশেষ করে, অদ্বৈতবেদান্তীর) Logic শাস্ত্র নৈয়ায়িকের Logic থেকে কয়েক অংশে মৌলিক ভাবে ভিন্ন। পাশ্চাত্য দর্শনে, হেগেল সাহেব যুগান্তকারী নতুন Logic সৃষ্টি করেন। তবুও তাঁর, এবং ভারতের অনেক দার্শনিক সম্প্রদায়ের (নব্যনৈয়ায়িক বাদে) Logic অতি-অধিকাংশে কোন-না-কোন অনুভবভিত্তিক। কিন্তু আধুনিক কালে পাশ্চাত্যদর্শনে Logic শাস্ত্রটা প্রায় সর্বাংশেই কলাকৌশলাশ্রয়ী (technical); প্রায়োগিক উৎকর্ষই এই সব Logic-এর একমাত্র মহিমা, এবং—স্বভাবতঃই—এই কারণে এই Logic-এর প্রকারভেদও ক্রমবর্ধমান।

'আমাদের দার্শনিক'দের বক্তব্য এই: খণ্ডনমণ্ডনশোধনসুসজ্জনের জন্য Logic-এর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কিন্তু Logic সর্বেসর্বা তো নয়ই, যদি কিছু সর্বেসর্বা থাকে তা হল অনুভব। Logic এই অনুভবের উৎকর্ষসাধনে অনেক সময়েই সহায়তা করে। কিন্তু বিনা Logic-এও নিজের চেষ্টায়, নিজের ক্রমবর্ধমান অখণ্ড মনোযোগের ফলে এবং চিত্তগত চাঞ্চল্য, মালিন্য, ক্লেশ, সংস্কার, বাসনাদি ও পরিবেশপ্রভাবের দূরীকরণ মাধ্যমে ঠিক ঠিক বিষয়ে ঠিক ঠিক অনুভবটি লাভ করা যায়। এরই নাম সাধনা বা যোগ। 'আমাদের দার্শনিকেরা' প্রধানতঃ এই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। বেদান্তসূত্রেই আছে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ…"। তাঁদের অনেকেই পরবর্তী কালে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি-জালপ্রসারে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, সত্য। কিন্তু কোন দিনই তাঁরা অনুভবকে শেষ কাম্য বলতে ভুল করেন নি।

'আমাদের দার্শনিকরা' যে ন্যায়পদ্ধতিতে সুষুপ্তিবিচার করেন নি তার প্রধান কারণ এইটাই। যুক্তিতর্কের খাতিরে তাঁরা ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্য অনেক কথাও বলেছেন। ন্যায়ও শাণিত শাণিততর যুক্তিপ্রয়োগে তাঁদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন, সমৃদ্ধতর বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। বেদান্তীরা আবার উত্তর দিয়েছেন। সে-সব কথার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এঁরা বললেন, সুষুপ্তি ভঙ্গের পরক্ষণে আমরা স্মরণ করি "আমি এতক্ষণ ছিলাম (শেষ হয়ে যাই নি) এবং কিছুই জানি না।" যে-বিষয়ের স্মরণ হয় স্মরণের পূর্বে—বর্তমান ক্ষেত্রে, সুষুপ্তিকালে—নিশ্চয়ই সে-বিষয়ের অপরোক্ষ অনুভব হয়েছিল। অতএব, সুষুপ্তিকালেও আমার অপরোক্ষ অনুভব ছিল

যে আমি আছি এবং কিছুই জানি নি। 'আমি' শব্দের নিছক অর্থ জ্ঞাতা কিংবা জ্ঞান। সচরাচর এই জ্ঞাতা বা জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত দেহ ও তদতিরিক্ত মন-বুদ্ধি, অর্থাৎ চিত্ত, সমন্বিত হয়েই বর্তমান থাকে। কিন্তু স্বপ্নকালীন অবস্থারও অতীত যে সুষুপ্তি অবস্থা—যা থেকে জেগে উঠে আমি বলি যে আমি এতক্ষণ কিছুই জানছিলাম না—সেই সুষুপ্তি অবস্থায় নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত দেহবোধ ছিল না, কারণ সুষুপ্তিভঙ্গে তদনুরূপ স্মরণ হয়নি (এবং অনুমানাদির দ্বারাও একথা প্রমাণিত করা যায় না)। সুষুপ্তি অবস্থায় চিত্তও কার্যকর ছিল না, কারণ চিত্তের কাজই হল কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানোৎ-পাদন, তা সেই বিষয় স্থূল ভৌতই হোক অথবা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের কোন পরিণামই হোক, অথবা স্বয়ং ব্যষ্টিমন, ব্যষ্টিবুদ্ধি বা ব্যষ্টিঅহঙ্কারই হোক; অথচ সুষুপ্তি অবস্থায় এজাতীয় কোনও জ্ঞান ছিল বলে জাগ্রদবস্থায় আমার স্মরণ হয় না। অতএব, জাগ্রদবস্থায় যে-আমি ছিলাম বলে স্মরণ হয়, সে আমি জ্ঞান মাত্র (বা জ্ঞাতামাত্র)—কোনও বিষয়ের জ্ঞান নয়। এই কথাই দৃঢ়ীকৃত হয় স্মরণের দ্বিতীয়াংশের দ্বারা—সুষুপ্তিভঙ্গের পরে স্মরণ হয় 'আমি এতক্ষণ কিছুই জানছিলাম না'। সেই বিষয়ই স্মৃত হয় পূর্বে যে-বিষয়ের অনুভব হয়েছিল। অতএব সুষুপ্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই কিছু-না-জানার অনুভব হয়েছিল—অর্থাৎ, জেনেছিলাম আমার কোনও জ্ঞান ছিল না।

কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত অবস্থা—একই সময়ে, বলছি 'আমি জেনেছিলাম' অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আমার জ্ঞান ছিল, আবার তখনই বলছি যে ঐ সুষুপ্তি-কালেই আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। এতে কি স্ববিরোধ হয় না? উত্তর, "না, যেহেতু নিছক স্মরণে কোনও স্ববিরোধ ধরা পড়ে না"। আরও বিশদ উত্তর এই যে, দুই স্থলে 'জ্ঞান' শব্দটি দুই বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই বিশদ উত্তর কোনও আপাত-প্রতীয়মান স্ববিরোধ থেকে উদ্ধার পাবার একটা উদ্‌ভ্রান্ত পন্থা নয়। সত্যই কেবল 'জ্ঞান' শব্দটা নয়, যে-কোন ভাষায় অভিহিত হোক না কেন, জ্ঞান-ব্যাপারটাই আমরা দুভাবে[১] বুঝি: এক, কোন এক নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান; দুই, অনির্দেশ্য বিষয় মাত্রের জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানীয় উন্মুখীনতা মাত্র। ঘাড় উঁচু করে কিছু (অনির্দিষ্ট কিছু) দেখতে চাওয়া যেমন এক রকমের জ্ঞান এবং সেই একই ভাবে ঘাড় 'উঁচু করে' নির্দিষ্ট কিছু দেখা যেমন আর-এক জাতীয় জ্ঞান, তদ্রূপ। পাশ্চাত্য দর্শনে ইংরাজি ভাষায় একটাকে

১। প্রয়োজন হলে আরও বিভিন্ন ভাবে বুঝি।

বলে consciousness as just forward-looking, as *a priori* anticipation of object-in-general, অথবা 'pure construction of forms of object' অথবা, আধুনিকতর ভাষায়, phenomenological intention; আর অপরটাকে বলে empirical knowledg of this or that definite object। [আপাততঃ সমস্ত ব্যাপারটাই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভঙ্গীতে বোঝা হচ্ছে।]

এতেও কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। কারণ, শৈব-শাক্ত ও মহাযান সম্প্রদায়ের দর্শন ছাড়া বিশেষ কোথাও জ্ঞানকে খোলাখুলি এই ভাবে non-empirically forward-looking, অর্থাৎ স্বভাবতঃই বহির্মুখীন, বলা হয় নি। সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানকে হয় নির্দিষ্টবস্তুবিষয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞান না-হয় চিন্মাত্র রূপে ধরা হয়েছে। অথচ আমরা এতক্ষণ যে দুই প্রকার জ্ঞানের কথা আলোচনা করলাম তার একটি নির্দিষ্ট-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান এবং অন্যটি অনির্দিষ্ট-বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ এমন জ্ঞানমাত্র যা বহির্মুখী। অদ্বৈতবেদান্তীর চিন্মাত্ররূপ জ্ঞান তো সুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত অন্তর্মুখী।

কিন্তু 'আমাদের দার্শনিক'দের বক্তব্য এই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই ক্রমবর্ধমান অন্তর্মুখিতা ও পূর্বোল্লিখিত অনির্দিষ্টবস্তুবিষয়ক ক্রমঘনায়মান বহির্মুখতার মধ্যে কোনও বিরোধ তো নেই-ই, বরং দুই-ই মূলতঃ একই জিনিষের দুই দিক মাত্র। যে বিশুদ্ধ চিৎ বিষয়রাজি থেকে ধাপে ধাপে প্রত্যাহৃত হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে ক্রমশঃ গুটিয়ে নিচ্ছে সে তো বিষয়-জগতের দিকে দৃষ্টি রেখেই পিছু হটছে। প্রথমেই যদি বিষয় জগৎ থেকে একেবারে দৃষ্টি ফেরাতে পারতো তা হলে তো ক্রমশঃ আরো আরো **পিছু হটবার** প্রয়োজন হতো না; তখন তো সে একবার বিষয় থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবার পর চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পারতো। বিপরীত লক্ষ্যাভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়াকে একভাবে 'পিছু হটা' বলা যেতে পারে, কিন্তু তাতে বিষয় থেকে **ধাপে ধাপে** সরে আসার অবকাশ থাকে না। প্রথম ধাপেই তো সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব, অদ্বৈতবেদান্তী বা সাঙ্খ্যযোগী যখন ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার কথা বলেন তখন, মনে রাখতে হবে, তিনি বলতে চাইছেন যে তাঁর দৃষ্টি বহির্মুখী রূপে সম্মুখদিকেই নিবদ্ধ আছে, কেবল প্রতি পিছু-হটার ধাপে তৎপূর্ববর্তী ধাপের নির্দিষ্ট বিষয়টি তদ্বিষয়পুরস্কারে ক্রমশঃ আরো আরও অনির্দিষ্ট—ফলে ফলে, ক্ষীণতর ও অনির্দেশ্যতর রূপে সামনের দিকেই প্রতীয়মান থাকে। বিষয়ের এই ক্ষীণতরত্ব ও অনির্দেশ্যতরত্ব আমার জ্ঞানের কোনও

দোষজন্য হতে পারে না, কারণ সাধনমার্গে এই পিছু-হটা তো বিষয়জগৎকে ক্রমশঃ যথার্থতর রূপে জানারই প্রচেষ্টা। অর্থাৎ, যিনি যত আত্মনিমগ্ন হবেন, যত বাইরের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন, বিষয় ততই প্রকৃষ্টতর (যথার্থতর)—অথচ ক্ষীণতর ও অনির্দেশ্যতর—হবে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির একটি মাত্রই ব্যাখ্যা আছে। সেটি হল এই যে, জ্ঞান যতই বিশুদ্ধচিদাকার হবে ততই যথার্থ, প্রকৃষ্ট, অর্থাৎ **বিশুদ্ধ** বিষয় পাবে। ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে-কোন ধাপের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সেই ধাপের বিশুদ্ধ বিষয় পরস্পর অবিনাভাবী —একটি অপরটির বিপরীত পৃষ্ঠমাত্র। এর থেকে আরও সিদ্ধান্তিত হচ্ছে এই যে, হয় বিশুদ্ধতম বিষয় বিশুদ্ধতম জ্ঞান উৎপন্ন করে, না-হয় বিশুদ্ধতম জ্ঞান বিশুদ্ধতম বিষয় উৎপন্ন করে। 'বিশুদ্ধতম বিষয়' শব্দের অর্থ বিষয়ের বিশুদ্ধতম রূপ, তদ্রূপ 'বিশুদ্ধতম জ্ঞানে'র অর্থ জ্ঞানের বিশুদ্ধতম রূপ। বিষয়ের বিশুদ্ধতম রূপ আবার দুই প্রকার হতে পারে—(১) কূটস্থ বিষয়বস্তু (thing-in-itself), (২) বিষয়-মহাসামান্য (object-in-general)। তদ্রূপ, জ্ঞানের বিশুদ্ধরূপও দুই প্রকার হতে পারে—(১) কূটস্থ চিৎ (consciosness-in-itself), (২) চিৎ-মহাসামান্য (consciousness-in-general)। এদের মধ্যে, কূটস্থ বিষয়বস্তু কী করে বা না-করে, কী করতে পারে বা না-পারে, তা আমরা না-জেনে বলতে পারি না। অতএব, এই বিশুদ্ধতম ধাপে বিষয়বস্তু জ্ঞানোৎপাদন করেছে—একথা বলতেই আমরা পারি না। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধতম জ্ঞান কী করে বা না-করে তা তো সহজ ভাবেই আমরা জানি, অতএব বলতে পারি। অতএব, স্বীকার করতেই হবে যে, বিশুদ্ধতম জ্ঞান ও বিশুদ্ধতম বিষয়বস্তুর আপাত-প্রতীয়মান অবিনাভাব ব্যাপারটির একটি মাত্রই ব্যাখ্যা আছে—বিশুদ্ধতম জ্ঞান বিশুদ্ধতম বিষয়বস্তু উৎপন্ন করে। 'উৎপন্ন করা' শব্দটি হয়তো প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞাপক হল না। তাই এই কথা বলাই শ্রেয়ঃ যে, বিশুদ্ধতম বিষয়-বস্তুর সত্তা বিশুদ্ধতম জ্ঞানের প্রসঙ্গেই বোদ্ধব্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'বিশুদ্ধতম বিষয়বস্তু' শব্দে এখানে বুঝতে হবে বিষয়-মহাসামান্য (object-in-general) এবং 'বিশুদ্ধতম জ্ঞান' শব্দে বুঝতে হবে কূটস্থ চিৎ (consciousness-in-itself), চিৎ-মহাসামান্য (consciousness-in-general) নয়। চিৎ-মহাসামান্য এখানে বোদ্ধব্য নয় এইজন্য যে, কূটস্থ চিতের উপযোগিতা স্বীকার করলে আর চিৎ-মহাসামান্যের উপযোগিতার প্রয়োজন থাকে না। ফলে, সমগ্র ব্যাপারটি দাঁড়াল এই যে, বিশুদ্ধতম ধাপে কূটস্থ চিতের প্রয়োজনেই এবং তারই কার্যকারিতায় বিষয়মহাসামান্য (object-

in-general ) উপস্থাপিত হয়। একেই পাশ্চাত্য কান্টীয় বা হুসার্লীয় দর্শনে বলা হয় "object-in-general constructed ( anticipated *a priori* or intended as essence by pure subjectivity" ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যারই নাম জ্ঞানের সহজাত ( *sui generis* ) বহির্মুখিতা, বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে তারই নাম জ্ঞানের অন্তর্মুখিতা, ক্রমবর্ধমান স্বাত্মলাভ, ক্রমদৃঢ়ীভূত স্বপ্রতিষ্ঠত্ব। যে-সব অদ্বৈত বেদান্তীর মতবাদ এখানে সমালোচিত হচ্ছে তাঁরা সচরাচর জ্ঞানের বিশুদ্ধতা বলতে কেবল এই অন্তর্মুখিতাই বুঝেছেন বলে তাঁদের কাছে জ্ঞানের সহজাত বহির্মুখিতা প্রথমটায় দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। সেইজন্যই আমরা এতক্ষণ দেখাবার চেষ্টা করলাম যে এই অন্তর্মুখিতা ও সহজাত বহির্মুখিতা মূলতঃ একই ব্যাপার। প্রাচীন অদ্বৈতপন্থীরা এই বহির্মুখিতাও একভাবে মেনেছেন। তাঁদের অজ্ঞানবৃত্তিক সাক্ষিজ্ঞান সহজভাবেই বহির্মুখী। অবশ্য, তাঁদের এই সাক্ষিজ্ঞান জ্ঞানের বিশুদ্ধতম রূপ নয়। কিন্তু যদি এতটাই স্বীকার করা হয় তাহলে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এর চেয়েও বিশুদ্ধতর অবস্থা অনায়াসেই কল্পনা করা যায় যেখানে শুধু অজ্ঞানশক্তিমৎ জ্ঞান থাকে, অজ্ঞানের কোন বৃত্তিও থাকে না। অদ্বৈতবেদান্তীর ঈশ্বর কি এই পর্যায়ের নন? তাছাড়া, অদ্বৈতবেদান্তী কি সুষুপ্তির বিশ্লেষণে ঠিক এই কথাই বলেন নি? সুষুপ্তিতে কেবল অজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকে, এ-কথার অর্থই হল 'আমি কিছু জানছি না' এই বোধ থাকে। এই 'কিছু'টা কী জিনিষ? এটা কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নয়, অথচ একান্ততঃ অবিষয়ও নয়। এরই নাম কি বিষয়-মহাসামান্য নয়, যেটা কখনও জ্ঞানের নির্দিষ্ট বিষয় নয়, অথচ সামান্যতঃ সব জ্ঞানেরই মৌলতম বিষয়? অদ্বৈত-বেদান্তীর ভাবরূপ অজ্ঞানই কি কান্টের *a priori* anticipation নয়, হুসার্লের 'intention' নয়? অজ্ঞান=না-জানা=নির্দিষ্ট কিছু না-জানা= একান্ত অনির্দেশ্য বিষয়-মহাসামান্য ( object-in-general ) জানা—এই সমীকরণে দোষ কোথায়?

এ-বিষয়ে সাঙ্খ্যযোগ দার্শনিকদের মত স্পষ্টতর এবং শৈবদের মত স্পষ্টতম। সাঙ্খ্যযোগমতে পুরুষ যেমন 'কেবল' তেমনই দ্রষ্টা, সাক্ষীও বটে। 'কেবল' শব্দের অর্থ কূটস্থ, সম্পূর্ণ আত্মস্থ, কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। কিন্তু দ্রষ্টা ও সাক্ষী আত্মস্থ হয়েও সহজ ভাবে বহির্মুখী; এই সহজাত বহির্মুখিতার জন্যই জীবন্মুক্তি সম্ভব। অদ্বৈতবেদান্তীও সাক্ষিতা ও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন, কিন্তু সাঙ্খ্য-যোগ দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এই যে, তাঁদের মতে এই সাক্ষিতাও

যেমন, তদ্রূপ জীবন্মুক্তিও, প্রকৃত মুক্তি থেকে ঈষদূন—সাক্ষী ও জীবন্মুক্তের ক্ষেত্রে শেষতম অজ্ঞানরেশ থেকে যায়—কিন্তু সাঙ্খ্যযোগ মতে পূর্ণমুক্ত পুরুষ ঠিক যতটা 'কেবল' অর্থাৎ কূটস্থ, ততটাই সাক্ষী, দ্রষ্টা ও মধ্যস্থ। যোগসূত্রে ও ভাষ্যে এই কথা বহুবার বলা হয়েছে, এবং এটা যদি সাঙ্খ্যমত না হতো তাহলে তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত কারিকাবলীর একটিতে ঈশ্বরকৃষ্ণ পুরুষতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে একই নিশ্বাসে 'কেবল, দ্রষ্টা, সাক্ষী, মধ্যস্থ' এতগুলি কথা বলতেন না১। শৈবমতে শিব যেমন অনুত্তর ঠিক তেমনই আবার একদিকে বিমর্শাকার পরাশক্তির সমরস এবং অপর দিকে মহামায়ারূপ শক্তির খেলায় নিজেকেই (অথবা মতান্তরে শক্তি নিজেকেই) 'ইদং' রূপে উপস্থাপিত করেন। এই 'ইদং'-এর নামই সহজ বিষয়-মহাসামান্য (object-in-general)। শৈবদের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তীর প্রভেদ দুই ব্যাপারে: (১) মায়া (শৈবমতে মহামায়া) নিজেকে (অথবা শিবকে) যে-ইদং-রূপে নিজের সম্মুখে উপস্থাপিত করে সেই 'ইদং' কোনও অংশে মিথ্যা নয়—ওটা শুধু নিবৃত্তিকলামুখে আত্মসংকোচন যারই অপর নাম প্রবৃত্তিকলামুখে আত্মপ্রসার বা সৃষ্টি—কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তমতে সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে মিথ্যা, এমন কি উপস্থাপন ক্রিয়াটাই, অর্থাৎ মায়া নিজেই, মিথ্যা এবং আখেরে অসৎ। শৈবমতে এটা 'মহামায়া'র খেলা এবং সমগ্র-ভাবে সৎ, যদিও পরে অজ্ঞানরূপ মায়ার খেলায় যখন এই 'ইদং এবং তার যাবৎ প্রকারভেদ চিৎ-নিরপেক্ষ স্বনির্ভর রূপে প্রতীয়মান হয় তখন সেই সেই অবভাস সকল মিথ্যা। এই হল অদ্বৈতবেদান্ত এবং শৈবমতের প্রথম মৌল প্রভেদ। দ্বিতীয়তঃ, (২) অদ্বৈতপক্ষে যখন একান্ত মিথ্যা মায়ার একমাত্র কাজ মিথ্যা 'ইদং' এবং 'ইদং'-এর যাবৎ মিথ্যা প্রকারভেদ সৃষ্টি, তখন শৈবপক্ষে মহামায়া কর্তৃক ইদং-সৃষ্টির আগে সূক্ষ্মতর পরাশক্তি কর্তৃক শিব প্রথমে বিমর্শবান্, অর্থাৎ আত্মসচেতন (self-conscious) হয়েছিলেন। শৈবমতে, প্রথমে অনুত্তর শিব (অবশ্য তাঁর মধ্যে শক্তি নিদ্রিত আছেন), তারপরে (সেই) শক্তি জাগ্রৎ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামরস্যও স্থাপিত হয়, অর্থাৎ শিব (তদ্রূপ শক্তিও) আত্মসচেতন হন।

যাই হোক, জ্ঞানের সহজাত বহির্মুখিতা যে কোনও-না-কোন ভাবে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত সেই কথা প্রমাণিত হল।

১। পরবর্তী টীকাকারদের ভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যাদান সত্ত্বেও নানা দিক বিবেচনা করে অন্য সুরে কথা বলতে সাহসী হলাম।

এমন কি মীমাংসকেরাও প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরাও সম্বিৎ ও জ্ঞানে প্রভেদ মেনেছেন: জ্ঞান তাঁদের মতে চিৎ-ক্রিয়া, কিন্তু সম্বিৎ চিৎ-স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে চিৎ ( অথবা জ্ঞান ) সম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে, যাঁদের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল তাঁরা সকলেই বলেন যে এই পদার্থটির দুটি দিক আছে। একটি দিক হল চিত্তের কৌটস্থ্য বা কৈবল্য, যার ইংরাজি নাম consciousness-in-itself, এবং অপর দিকটি হল এর সহজাত বহির্মুখিতা, অথবা, অন্য দিক থেকে বিবেচনা করলে, বিষয় রাজ্য থেকে এর ক্রম-আত্মসংকোচন, ক্রমশঃই নিজের মধ্যে নিজেকে বেশি করে গুটিয়ে আনা, যার ইংরাজি নাম progresive dissociation। এই ক্রম-আত্মসংকোচক ( progresively dissociating ) বা সহজাতভাবে ক্রমবর্ধমান বহির্মুখ চিৎ বা জ্ঞানের নাম চিৎশক্তি বা চিতিশক্তি বা জ্ঞানশক্তি ( স্থলবিশেষে সাক্ষিতা )— ইংরাজি প্রতিশব্দ হল consciousness as subjectivity. এরই বিশুদ্ধতম অবস্থার প্রতীক হল সুষুপ্তি—প্রতীক কেন, একজাতীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরও অতীত, এরও উপরে, এই চিৎ বা জ্ঞানের আর এক অবস্থা আছে, যার নাম চিৎ-স্বরূপ বা জ্ঞান-স্বরূপ, যে কেবল কূটস্থ, সম্পূর্ণরূপে স্বস্থ, consciousness-in-itself, যার পক্ষে নিজের বাইরে যাবার বা তাকাবার প্রয়োজন নেই, তাগিদ নেই, অথবা, বিপরীতমুখে, যার পক্ষে বিষয়রাজ্যের সূক্ষ্মতম ধাপ থেকে আর আত্মসংকোচনের প্রয়োজন নেই, কোনও কথাই নেই। এই চিৎস্বরূপ হল subject-object-এর অতীত, নিছক কূটস্থ। সুষুপ্তি যদি বিশুদ্ধতম subjectivty'র প্রতীক বা দৃষ্টান্ত হয়, তাহলে চিৎস্বরূপের প্রতীক বা দৃষ্টান্তস্থল হবে মাণ্ডূক্যোপনিষদে যাকে বলা হয়েছে তুরীয়।

সুষুপ্তিতে যে-আনন্দবোধ হয় তৎসসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য যে সেই আনন্দ ও তুরীয়াবস্থ আনন্দের মধ্যে প্রভেদ মেনেছেন, সে-কথা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। আমরা দেখিয়েছি মাণ্ডূক্যকারিকাকার সম্ভবতঃ এ-ভাবে ভেদরেখা টানেন নি: তিনি খোলাখুলি বলেছেন যে, সুষুপ্তিকালে থাকে আনন্দ, কিন্তু তুরীয়াবস্থায় থাকে শান্তি বা চরম উপশম। এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও আমরা যথাস্থানে করেছি। এখন আমাদের বিশেষ বক্তব্য এইটুকু যে, শৈবদর্শনেও কারিকাকারের কথার সমর্থন পাওয়া যায়। শৈবমতে অনুত্তর শিবাবস্থায় আনন্দ নেই। আনন্দ তখনই হয় যখন সামরস্য অবস্থায় সমরস শিব-শক্তি নিজের পূর্ণতা দেখে নিজেই উদ্বেলিত হয়ে ইচ্ছাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, অথবা যখন তারও

পরে, অথচ একান্ত শুদ্ধ অস্থায়, এই সমরসতত্ত্ব সৃষ্ট্যুন্মুখী হয়। এ-সবের অতীত অবস্থায় যে কূটস্থ চিৎ সেই একক শিব শান্তস্বরূপমাত্র। প্রচলিত অদ্বৈতবেদান্তে কিন্তু কূটস্থ ব্রহ্মকে যেরূপ সৎস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ বলা হয় তদ্রূপ আনন্দ-স্বরূপও বলা হয়। আবার সুষুপ্তাবস্থায়ও আনন্দ বোধ হয় বলে প্রচলিত অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকৃত। এই দুই আনন্দের প্রভেদ সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর কারিকাভাষ্যে কী বলেছেন তাও আমরা দেখেছি। এই প্রসঙ্গে এক বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। সেই বিকল্প ব্যাখ্যাটি হল এই :

চিৎ যেরূপ কূটস্থ অবস্থায় চিৎস্বরূপ ( consciousness-in-itself ) এবং তন্নিম্ন অবস্থায় চিৎ-শক্তি, অর্থাৎ consciousness-in-action, *i.e.* consciousness as an act either of negative dissociation or of positive *a priori* anticipation, তদ্রূপ আনন্দের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে কূটস্থাবস্থ আনন্দ আনন্দস্বরূপ এবং তন্নিম্ন অবস্থায় যে-আনন্দ তা আনন্দ-শক্তি। যাই হোক, এ-বিষয়ে বেশি কিছু বলার দুঃসাহস না দেখানই শ্রেয়ঃ। কারণ, প্রকারান্তরে শাঙ্করমতের সমর্থনও পাওয়া যায় যোগমতে। যোগমতে সুষুপ্তির যে-আনন্দ সেটা দুঃখও মোহের সমপর্যায়ী, কারণ 'সুখমহস্বাপ্স্যম্' বলে জাগ্রৎ কালে যেমন স্মরণ হয় তেমনই 'দুঃখমহমস্বাপ্স্যম্' এবং 'মূঢ়মহমস্বাপ্স্যম্' বলেও বিভিন্ন সময়ে স্মরণ হয়। এর একটি মাত্র অর্থ এই যে, এই সুখ, দুঃখ এবং মোহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আপেক্ষিক প্রাবল্যনিমিত্তক।

সুষুপ্তির ঊর্ধ্বে যেমন তুরীয়, তদ্রূপ তন্নিম্নে স্বপ্নাবস্থা। তুরীয়ের কথা পরে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে। স্বপ্ন সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি প্রয়োজনীয় কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, কারণ তার প্রেক্ষিতে জাগ্রৎ অবস্থার ব্যাখ্যা অনেক সহজ হবে। সুষুপ্তাবস্থায় যে সহজ-বাহির্মুখিতা, যারই অপর নাম সৃষ্ট্যুন্মুখিতা, সেই উন্মুখিতা-মহাসামান্যই যথাযথ সামগ্রী-সন্নিধানে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ বিষয় আপনা থেকেই সৃষ্টি করে। এ-কথা স্বপ্নের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনই জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধেও সত্য। কেবল, একবার সুষুপ্তিতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হলে স্বপ্নক্ষেত্রে এর সত্যতা স্পষ্টীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। জাগ্রদবস্থার জগৎ সম্বন্ধে এই সত্যের উপলব্ধি বিশেষ আয়াসসাধ্য। যথাস্থানে সে-বিষয়ে আলোচনা হবে।

স্বপ্নের ক্ষেত্রে উপাদানসামগ্রী আসে প্রত্যেকের চিত্তে সঞ্চিত সংস্কার-ও-বাসনা-ভাণ্ডার থেকে। এই সংস্কার ও বাসনা বহুপূর্বে সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে, এমন কি পূর্ব পূর্ব জন্মেও সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই এই সঞ্চয় ইহজন্মের, এবং এর অনেকগুলিই অচিরকাল পূর্বেকার। সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় প্রধানত: তাৎক্ষণিক কারণসমাবেশে, যে-কারণসামগ্রীর মধ্যে একটি থাকে বলবত্তম। এই তাৎক্ষণিক কারণ দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারেরই। ফলে, বিষয়াকারে সৃষ্ট বা উপস্থাপিত হয় নানা ব্যষ্টিবিষয়, তাদের আধাররূপ আকাশ, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কস্থাপক কাল, তাদের মধ্যেকার বিভিন্ন সম্পর্ক ও এক একটি স্বপ্নজালের আপেক্ষিক একত্ব। এই সব সম্পর্ক জাগ্রৎ-জগৎস্থ বিভিন্ন সম্পর্কের অনুরূপ; তার কারণ, স্বপ্নান্তর্গত যাবতীয় সম্পর্ক জাগ্রৎ-জগতন্তর্গত সম্পর্কজ্ঞানের সংস্কারপ্রণোদিত। কিন্তু বেশ অনেকগুলি সম্পর্ক *a priori*—বিষয়-মহাসামান্যেরই (object-in-general) নানা প্রকারভেদ। এগুলি কেবল স্বাপ্নজগতেই *a priori* নয়, জাগ্রৎ জগতের ক্ষেত্রেও *a priori*।

এতক্ষণ সুষুপ্তি ও স্বপ্নের বিশ্লেষণ দেওয়া হল। তুরীয় সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হয়েছে। পরে আরও অনেক আলোচনা হবে। কিন্তু যে-অনুভব (experience) সাধারণ জীবের কাছে সব চেয়ে solid সত্য এবং সব চেয়ে আকর্ষণীয় সেই জাগ্রৎ অবস্থার (waking experience-এর) বিশ্লেষণ এখনও দেওয়া হয় নি। গৌড়পাদ ও শঙ্কর—এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী সব অদ্বৈতবেদান্তীই—এই জাগ্রৎ অবস্থার, অর্থাৎ এই স্থূলজগতের, বিষয়, সেই সব বিষয়ের জ্ঞান ও যার এইরূপ জ্ঞান হয় দেহেন্দ্রিয়চিত্তধারী সেই জীবের বিশ্লেষণ স্বপ্নপ্রক্রিয়ার ভাষাতেই করেছেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন, স্বাপ্নবস্তু যেমন চিত্তরূপে পরিণত সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের—অর্থাৎ, নির্বিশেষ বহির্মুখিতা-মাত্রের—স্পন্দ বা function বা intention বা construction এবং তা-ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছু নয়, এবং সেইজন্যই মিথ্যা, এবং অধিকন্তু তদনুভব ও তাদের অনুভবিতা-রূপ স্বপ্নকালীন জীবও যেমন মিথ্যা, জাগ্রদবস্থায় লব্ধ বিষয়াবলীও, এবং তাদের অনুভব ও তদবচ্ছেদে অনুভবিতা, অর্থাৎ জাগ্রৎ জীবও, ঠিক তেমনই মিথ্যা। যে-ভাবেই তাঁরা এটা দেখান না কেন, তাঁদের কাছে স্বপ্ন (এবং সুষুপ্তি) দার্শনিক দৃষ্টিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। সচরাচর আমরা মিথ্যা রজ্জুসর্প ও স্বপ্ন (এবং সুষুপ্তি) কে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগুলি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হলেও যেহেতু জাগ্রৎ অবস্থাকালীন স্থূল জগৎ ও তৎসম্পর্কিত সূক্ষ্ম মনোজগতের সঙ্গে এই মিথ্যা সর্প, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কোনও definite calculable নির্বাচ্য সম্পর্ক খুঁজে পাই না—অর্থাৎ জাগ্রৎ জগতের মধ্যে কী ভাবে মিথ্যাসর্প, স্বাপ্ন জগৎ ও সুষুপ্তি অবস্থান করছে, জাগ্রতের

পরিমাপে নির্ধারিত আট বর্গহাত পরিমিত শয্যায় শায়ী ছয় বর্গহাত পরিমিত দেহধারী এক জীব এক ঘণ্টার স্বপ্নে কেমন করে যে বহুদূরবর্তী এবং সাতদিনব্যাপী স্বাপ্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারে, কেমন করে একখণ্ড সত্য রজ্জুতে মিথ্যা সর্প থাকতে পেরেছিল, আদৌ থেকে ছিল কিনা, না থেকে থাকলে আমি এতক্ষণ দেখলাম কী, এরা—অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসমূহ এবং মিথ্যাসর্প হঠাৎ চলেই বা গেল কোথায়, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কালটুকু জাগ্রৎ জগতের কালের সঙ্গে unilinear কিনা,—এই সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর আমরা পাই না। এগুলি সব সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপার বললেও রেহাই পাওয়া যাবে না, কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্ত বা মনের যে-সব ব্যাপার চলে সে-সবও তো সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপার, অথচ স্থূলজগতের সঙ্গে সে-সবের কার্যকারণরূপ নির্বাচ্য সম্পর্ক পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম যে মিথ্যা সর্প বা স্বাপ্নিক ব্যাপার তার সঙ্গে তো স্থূল জগতের কোনই নির্বাচ্য সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এই অসহ্য অনির্বাচ্যতার জন্যই আমরা মিথ্যা সর্পাদি, স্বাপ্নজগৎ ও সুষুপ্তিকে বেমালুম অগ্রাহ্য করে যাই।

যতক্ষণ স্থূল জাগ্রৎ জগতে আমাদের অচল আস্থা থাকে ততক্ষণ তার সঙ্গে অসম্পৃক্ত—যদিও কোনও ভাবে তার মধ্যেই ঘটেছে বলে প্রতীয়মান—এই সব অনির্বাচ্য সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি অগ্রাহ্য করে চললে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি কোনও কারণে স্থূল জগতের প্রতি আস্থা কমে যায়? যতক্ষণ আমরা naturalist বা empiricist, অর্থাৎ পুরোপুরি এই স্থূলজগতের মধ্যে আছি, এরই যে-কোন ঘটনা—তা সে স্থূল ঘটনাই হোক অথবা সূক্ষ্ম মানসিক ঘটনাই হোক—এরই অন্য কোন ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত করে বুঝি, ততক্ষণ স্থূল জগতের প্রতি আমাদের আস্থা অবিচল থাকে। কিন্তু মিথ্যা সর্পাদি কোথা থেকে এল, কোথায় বা গেল, স্বাপ্ন ব্যাপারগুলি কোথা থেকে এল এবং জেগে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে কোথায় অন্তর্হিত হল, এই সব প্রশ্ন যার মনে একবার ওঠে তার কাছে আর এগুলি নিরর্থক 'মজার ব্যাপার' ( side-show ) নয়। সে তখন নিছক সূক্ষ্ম বস্তুর, অর্থাৎ স্থূল জগতের সঙ্গে একান্ত অসম্পৃক্ত সূক্ষ্ম বস্তুর, আভাস পায়; সে বুঝতে পারে, মন এবং সমগ্র মনোজগৎ—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ও তাদের স্পন্দাত্মক আভাসিত যাবৎ বস্তু —নিজ মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ একটা সূক্ষ্ম স্বাধীন রাজ্য, যার নাম সূক্ষ্মদেহ। আরও মনে হয়, সুষুপ্তিতে এই সমগ্র সূক্ষ্মশরীর আরও সূক্ষ্ম পিণ্ডীভূত আকারে অজ্ঞান বা মায়ারূপে বর্তমান—এই সূক্ষ্মতম পিণ্ডীভূত অজ্ঞানের নাম দেওয়া হয়

কারণশরীর। অর্থাৎ, আমাদের স্থূল দেহ ও স্থূল জগতের আড়ালে কত কী সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ব্যাপার স্ব স্ব মহিমায় ঘটে চলেছে তার কিছুটা আভাস মেলে। মিথ্যা সর্প, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তখন আর অগ্রাহ্য করে ফেলে দেবার জিনিষ বলে মনে হয় না।

পক্ষান্তরে, এ সব আভাস তখনই পাই যখন কোনও কারণে এই স্থূল solid জগতের উপর আমাদের আস্থা কমে যায়। কিন্তু কমবে কেন? শুধু যদি মিথ্যাসর্প, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং এদের ব্যাখ্যানুসন্ধান করি তাহলে সে ব্যাখ্যা যে অদ্বৈতবেদান্তসম্মত হবেই, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সেইজন্যই তো যাঁরা পুরোপুরি naturalist, এই স্থূলজগতের প্রতি যাঁদের আস্থা অটুট, এবং সূক্ষ্ম জগৎকে যাঁরা স্থূল জগতের ভাষায়, স্থূল জগতের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত করেই, বোঝেন তাঁদের কাছে মিথ্যাসর্প ও স্বপ্নাদি কোনও অপার্থিব ঘটনা নয়। এদের ব্যাখ্যা তাঁরা empirical স্থূল জগৎ এবং তৎসম্পৃক্ত সূক্ষ্ম মনোজগতের ভাষাতেই দেন। ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসক সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা তো এই ভাষাতেই মিথ্যাসর্প ও স্বপ্নাদির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Empirical জগতের প্রতি আস্থা হারাবার কোন কারণই তাঁদের থাকে না। তাঁদের অন্যথাখ্যাতি ও অখ্যাতিবাদে মিথ্যা ও স্বাপ্নবস্তু-গুলির স্থান এই জগতেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টে সুষুপ্তিরও অনেক সরলতর ব্যাখা তাঁরা—বিশেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা—দিয়েছেন।

তাহলে অদ্বৈতবেদান্তের (ও বহুলাংশে মহাযানী বৌদ্ধের) অপ্রাকৃত খ্যাতিবাদের প্রয়োজন হল কেন? উত্তর এই: কোনও কারণে তাঁরা সমগ্র স্থূল জগৎ (যার মধ্যে স্থূলের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বস্তুও গৃহীত) সম্বন্ধে **সামগ্রিক ভাবে** (as a whole) কিছু বলতে চান। সমগ্র স্থূল জগৎ অনিত্য দুঃখময়, সমগ্র স্থূল জগতের মূল কিছু একটা আছে, যে মূলে পৌঁছাতে পারলে সর্ব দুঃখের, সর্ব অনিত্যতা-বোধের, অস্থিরতার, নিঃশেষে অবসান হয়, অথবা যে-মূল আয়ত্ত করতে পারলে সমগ্র জগৎই আয়ত্তে আসে। **সামগ্রিক ভাবে** যাঁরা জগৎকে এই পথে বুঝতে চান, বা অধিকারে আনতে চান, কোনও না কোন ভাবে তাঁদের এই **জগতের বাইরে** দাঁড়াতে হয়। অদ্বৈতবেদান্তী, মহাযানী বৌদ্ধ, শৈবশাক্ত সম্প্রদায় এবং এক ভাবে বৈষ্ণব বেদান্তীরাও এই পথে জগতের বাইরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে এই 'বাইরে দাঁড়াবার' প্রচেষ্টায় প্রথম দাঁড়াতে হয় মিথ্যা ও স্বপ্নের রাজ্যে,

অর্থাৎ সূক্ষ্ম রাজ্যে, তার পরে যেতে হয় সমগ্র মিথ্যা ও স্বপ্ন রাজ্যের বাইরে সূক্ষ্মতর 'কারণ' রাজ্যে, অর্থাৎ মূল মায়া বা অজ্ঞানের রাজ্যে, যার বোধ আমরা পাই সুষুপ্তিতে, এবং তারও পরে এই সমগ্র অজ্ঞানকেও অতিক্রম করে, অপনোদন করে, পৌঁছাতে হয় মিথ্যা মায়ার যিনি অধীশ্বর, ঐন্দ্রজালিকের মতন যিনি এই মায়ার খেলা দেখান, তাঁর স্বরূপে। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।

ন্যায়বৈশেষিকপন্থী ও মীমাংসক দার্শনিক এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন। ন্যায়বৈশেষিকপন্থীরা বলেন সমগ্র স্থূল (ও তৎসম্পর্কিত সূক্ষ্ম) জগতের বাইরে যদিও ঈশ্বর নামক কিছু একটা ব্যাপার আছে, তথাপি সেই ঈশ্বরও এই স্থূল জগতের সহিত কার্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তিনি এই জগতের কারণ, তিনি জগতের স্রষ্টা এবং পালক। এক ভাবে তিনি সমগ্র জগতের বাইরে হলেও, যেহেতু তিনি এর কারণ (নিমিত্ত কারণ) সেই হেতু অন্য এক ভাবে তিনি জগতের মধ্যেও। জগতের সঙ্গে যা-কিছু আরম্ভক রূপে (উপাদান রূপে নয়) কার্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সেই সব নিয়েই তো জগৎ। অতএব ন্যায়বৈশেষিকের অপ্রাকৃত (supernormal) একান্ত প্রাকৃতবিলক্ষণ নয়; অপাকৃত প্রত্যক্ষলভ্য নয়, অনুমানগম্য (to be inferred)—এইমাত্র বিশেষ। এটাও কিন্তু ঠিক ন্যায়বৈশেষিকের বক্তব্য হল না। প্রকৃতপক্ষে, ন্যায়বৈশেষিকপন্থী বলতে চান যে, যে-কোনও জাগতিক বস্তুর অন্ততঃ একটি সাধারণ নিমিত্ত কারণ হলেন ঈশ্বর, এবং যেখানে যেখানে জাগতিক বস্তুর কোনও জানাশোনা চেতন কারণ পাওয়া যায় না সেখানেই ঈশ্বররূপ চেতন কারণ স্বীকার করতে হয়। ন্যায়বৈশেষিক মতে 'যে-কোনও'='সমগ্র' নয়। সমগ্র=সমুদায়: 'সমগ্র ক' হল যাবৎ 'ক'-এর একত্র সমাবেশ। কিন্তু 'যে-কোনও ক' হল কত্ব পুরস্কারে এই ক, ঐ ক, ইত্যাদি।

মীমাংসকগণ আরও কট্টর জগদ্বাদী। তাঁরা জগতের স্রষ্টা বা পালয়িতা রূপে ঈশ্বরই মানেন না। তাঁদের মতে, 'সমগ্র জগৎ'—এই ধারণাটাই ভ্রমাত্মক। জগতে এই জিনিষ, ঐ জিনিষ, ঐ জিনিষ, এই সমগ্র, ঐ সমগ্র, ঐ সমগ্র প্রভৃতি আছে। কিন্তু জগতের বাসিন্দা হয়ে, জগতের অন্তর্ভূত হয়ে, জাগতিক পদার্থ নিচয়ের অন্যতম পদার্থ হয়ে, আমি কী করে 'সমগ্র জগতের' কথা বলতে পারি? মীমাংসা-মতে এটা হতেই পারে না। এ-বিষয়ে মীমাংসকগণ পাশ্চাত্য জগতের আধুনিকতম কট্টর empiricist-এর দোসর।

অদ্বৈতবেদান্তী ও মহাযানী বৌদ্ধ[১] কিন্তু এ-ব্যাপারে ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। তাঁদের মতে জগৎ-অতিক্রান্তির দুটি ন্যায্য পথ আছে। একটি সম্পূর্ণ ন্যায্য, দ্বিতীয়টি প্রায়-ন্যায্য। এর আগে আমরা এঁদের দ্বিতীয় পথটির কথাই আলোচনা করেছি। সেটি হল সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদির মাহাত্ম্য বোঝবার চেষ্টা। একবার সর্পভ্রম ও স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতে পারলে সেই নিরিখে জাগ্রদবস্থাগম্য স্থূল জগৎটাও অনুধাবন করা যেতে পারে। স্বাপ্নজগতের সঙ্গে আমাদের এই স্থূল জগতের প্রভেদটা কোথায়? স্বপ্নজগৎ একা আমাকর্তৃক দৃষ্ট, যথা সর্পরজ্জু; কিন্তু একই স্থূলজগৎকে আমি, তুমি ও অন্যান্য সকলেই একই রূপে দেখছি—এইটাই কি এদের মধ্যে প্রভেদ? অথবা, স্থূল জগৎ যে খাঁটি সত্য, তার কারণ স্বপ্নের বা মিথ্যা সর্পের মতো এর নিরন্বয় বিনাশ হয় না, এই ব্যাপারটা? দ্বিতীয় ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হেতু হতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ আমাদের স্বীকৃত শাস্ত্রে মুক্ত পুরুষের কাছে এই জগতের নিরন্বয় বিনাশের ভূরি ভূরি কাহিনী আছে। দ্বিতীয়তঃ, নিরন্বয় বিনাশ না হলেও কোনও আভাসিত বস্তুকে মিথ্যা বলা যায় অন্য কোনও কারণে, যেমন বিশালকায় চন্দ্রের বহুদূরে অবস্থান নিবন্ধন স্বল্পকায়ত্ব। চন্দ্রের স্বল্পকায়ত্ব যে মিথ্যা তার হেতু হল বহুদূরে তার অবস্থান। তদ্রূপ, জগৎও যে মিথ্যা তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে—'যেহেতু এই জগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয় (দৃশ্যত্বাৎ)' ইত্যাদি। দৃশ্যত্বাদি কেমন করে মিথ্যাত্বের হেতু হতে পারে সে-কথায় পরে আসা যাবে। এখন দেখা যাক্, তুমি, আমি এবং অন্যান্য অনেকে একই এই জগৎকে একই ভাবে দেখছি বলে এটা মিথ্যা হতে পারে না—এই কথা গ্রহণযোগ্য কি না। প্রথমতঃ, আমরা সকলে একই ভাবে দেখছি কিনা তার প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই, থাকতে পারে না। একই রং বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে দেখলেও একই শব্দপ্রয়োগে—যথা 'এটা লাল' এই ভাবে—কথার আদানপ্রদান চলতে পারে যাতে কেবল **মনে হয়** মাত্র যে আমরা সকলে রংটিকে ঠিক একই ভাবে দেখছি। সত্যই একই ভাবে সকলে দেখেছি কি না তার কোনও মাপকাঠি নেই। তা ছাড়া, নিজ নিজ সংস্কার বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকেই এই জগৎকে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি। অবশ্য, তা সত্ত্বেও অনেকটা অংশ আমরা একই ভাবে দেখি, একথা

---

১। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণববেদান্তীদের কথা এখানে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

হয়তো বলা যায়; কিন্তু তাতে কি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই জগৎ সত্য? স্বপ্নেও আমি একা থাকি না—স্বপ্নদ্রষ্টা রূপে স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা যে-আমি তার চারিপাশে ঐ স্বপ্নরাজ্যেই আরও অনেকেই তো থাকে যাদের সঙ্গে জাগ্রৎ জীবনের মতোই কথাবার্তা, খেলাধূলা, সামাজিক আদানপ্রদান সবই ঐ স্বপ্নে চলে।[১] ঐ স্বপ্নে আমি যে-জিনিষটি যে-ভাবে দেখি তারাও নিশ্চয়ই অনেকটা সেই ভাবে দেখে, নচেৎ কথাবার্তা, খেলাধূলা ও অন্যান্য আদান-প্রদান সম্ভব হল কী ভাবে? কিন্তু, কই, ঐ কারণে তো স্বপ্ন জগৎকে কেউই সত্য বলে না।

প্রতিপক্ষী আপত্তি করতে পারেন, বলতে পারেন—আমার স্বপ্নে দেখা অন্যান্য যে-সব মানুষ বা জীব তারা তো স্বপ্নে আমারই সৃষ্ট, আমারই মনের বিকার, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার যে জগৎ তাতে অন্যান্য যে-সব জীবের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান হয় তারা তো আমার সৃষ্ট নয়। উত্তরে আমাদের বক্তব্য: এ-কথা কি হলফ করে বলা যায়? স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বপ্নাবস্থ রূপে যে-'আমি', সেই আমিটাও তো স্বপ্নকালীন অন্যান্য জীবের মতন মিথ্যা অথবা স্বপ্নে সৃষ্টমাত্র, কেননা স্বপ্নভঙ্গের পর সেই স্বপ্নদ্রষ্টা 'আমি'কে জাগ্রৎ 'আমি' বহু বহু ক্ষেত্রে অস্বীকার করতে চায়। স্বাপ্ন আমি স্বপ্নে এমন অনেক ব্যবহার করি যেটা জাগ্রৎ অবস্থায় ওটা আমার ব্যবহার ছিল বলে কিছুতেই মানতে রাজি হই না। অনেক সময়ে স্বপ্নে আমার শারীররূপের-ও (চেহারার-ও) প্রভৃত পরিবর্তন হয়।[২] স্বপ্ন-ও-জাগ্রৎ-অবস্থা-সাধারণ যে-আমি, সে হল অজ্ঞানবদ্ধ মূল আত্মা, যে-আত্মা সুষুপ্তাবস্থায় অজ্ঞানবদ্ধ না হয়ে সজ্ঞানে অজ্ঞান-ব্যবহারক, অজ্ঞানোপাধিক, ভাবে বর্তমান থাকে, যে-আত্মা তুরীয়াবস্থায় অজ্ঞানলেশসম্পর্কশূন্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। স্বপ্নে সেই আত্মাই যে অজ্ঞানের বিক্ষেপরূপ কাজগুলি অজ্ঞানবদ্ধ ভাবেই করে সেটা সহজেই প্রমাণিত হয় এবং আমরা সে কথা স্বীকারও করে নিই। জাগদবস্থায়-ও যে তাই হয় এটা প্রমাণ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, এবং আমরা সহজে স্বীকারও করতে চাই না।

---

১। স্বপ্নদ্রষ্টা আমি ও স্বপ্নগত অন্যান্য জীবের চিত্ত ব্যতীত যেন-স্থূল দেহও রয়েছে মনে হয়। এই যেন-স্থূল দেহ প্রকৃত স্থূল দেহ নয়। চিত্তাতিরিক্ত এই যেন-স্থূল দেহের নাম সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র।

২। অনেকেই স্বীকার করতে চান না যে, স্বপ্নদ্রষ্টা 'আমি'টাও মিথ্যা। বর্তমান যুক্তিটি তাঁদের বিরুদ্ধে সহজেই প্রযোজ্য। আরও অগ্রসর

তাহলেই দেখা যাচ্ছে স্বপ্নাবস্থার সঙ্গে জাগদবস্থার প্রভেদ ঠিক কোথায়, বলা কঠিন। যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মা সুষুপ্তাবস্থায় প্রাজ্ঞ ঈশ্বররূপে বর্তমান সেই আত্মাই স্বপ্নাবস্থায় দুই রূপে বর্তমান থাকেন: স্বপ্নগত স্বপ্নদ্রষ্টা 'আমি' রূপে সেই আত্মার নাম তৈজস, যে-আত্মা স্বপ্নগত স্বপ্নদৃষ্ট অপরজীবের সমপর্যায়ী; আর যখন চিত্ত রূপে ঐ আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা আমাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই স্বপ্নগত অন্যান্য জীবকে, construct করেন তখন তাঁর নাম হিরণ্যগর্ভ। তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা আমি ও আমার স্বপ্নস্থ অন্যান্য জীব এতদুভয়সাধারণ মহাচিত্তরূপী আত্মা। অদ্বৈতবেদান্তীর বক্তব্য,—"তা হলে এ-কথা বলতে কী আপত্তি হতে পারে যে, জাগ্রদবস্থায় জগদ্দ্রষ্টা যে স্থূলদেহবান্ আমি ও জগৎস্থ স্থূলদেহবান্ যে অন্যান্য জীব এতদুভয়সাধারণ যে স্থূলদেহবান্ বিরাট্ বা বৈশ্বানর তিনি ঐ নিত্যশুদ্ধমুক্ত আত্মার জীবাকারেই স্থূলতম মিথ্যা রূপ; এবং ব্যষ্টিরূপ 'বিশ্ব' নামক স্থূল 'আমি' ও আমার স্বপ্নগত অন্যান্য যাবৎ ব্যষ্টিজীব এই বিরাট্ বা বৈশ্বানররূপ মহাস্থূল জীবের স্থূল বিরাট্ দেহের মাধ্যমে স্বান্তর্ভূত বিরাট্ চিত্তের স্পন্দ (construction বা intention) মাত্র?" অর্থাৎ, 'আমি'-রূপ ব্যষ্টিজীবের স্বপ্নকালস্থ সমস্ত স্বপ্নজগৎটাই যেমন আমার চিত্তের, অর্থাৎ আমি-রূপ চিত্তের, স্পন্দ বা কল্পনামাত্র, সারা জাগ্রৎ জগৎটাও তদ্রূপ বিরাট্ বা বৈশ্বানরের মহাচিত্তের (সাঙ্খ্যযোগদর্শনে যে-চিত্তকে 'মহৎ' বলা হয়) কল্পনামাত্র।

প্রতিপক্ষী আপত্তি করতে পারেন—এ-রকম কথা বলা যেতে পারে, এ-কথা ঠিক; কিন্তু বলতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা কোথায়? অদ্বৈতবেদান্তীর উত্তর,—বলতেই হবে, কারণ এজাতীয় যাবৎ দৃষ্টান্ত, যথা মিথ্যাসর্প স্বপ্ন ইত্যাদিকে, চিত্তকল্পিত রূপেই নিঃসন্দেহে বোঝা হয়েছে। বরং, প্রতিপক্ষী স্বপক্ষে কোনও নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবেন না। তিনি এই জাগ্রৎ জগৎ বা জগদন্তর্গত যা-কিছু দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করতে চাইবেন সে সবই তো সন্দিগ্ধ স্থল, সেই সবই তো অদ্বৈতবেদান্তী মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চাইছেন।[১]

---

হয়ে আমরা বলতে পারি যে, আমার স্বপ্ন-দেখা ব্যাপারটাও আগাগোড়া মিথ্যা, কেননা ওটাকে কিছুতেই জাগ্রৎ জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি না। অজাতিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় এই সব কথার অবকাশ আসবে।

১। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ঠিক বিপরীত পথে ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসাপন্থী দার্শনিকেরা প্রমাণ করতে চান যে মিথ্যাসর্প কোনও কল্পনা (construction) নয়। কিন্তু, স্বপ্নের ক্ষেত্রেও কি তাঁরা এই কথা বলবেন?

## তৃতীয় সমীক্ষা

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সমগ্র (জাগ্রৎ) জগৎটা, এমন কি এই জগতের স্রষ্টা ঈশ্বরও, সত্য কি মিথ্যা—এ প্রশ্ন যাঁর মনে উদিত হবে তিনি নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎটাকে 'এক লপ্তে', অর্থাৎ 'as a whole', ধরতে পেরেছেন। পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি যে, এক লপ্তে সমগ্র জগৎটা বুঝতে গেলে কোনও ভাবে জগতের বাইরে দাঁড়াতে হয়। কী ভাবে জগতের বাইরে দাঁড়ান সম্ভব? অদ্বৈতবেদান্তী, মহাযানী বৌদ্ধ ও সাঙ্খ্যযোগ তার পথ দেখিয়েছেন। জগৎ অতিক্রান্ত হবার—transcend করবার—পাশ্চাত্ত্য ঢং-এ বলা যায় transcendental দর্শন গড়ে তোলবার—প্রকৃষ্ট উপায় তাঁরা দেখিয়েছেন। সেটা হল জ্ঞাতা, দ্রষ্টারূপ 'আমি'কে ঠিক ঠিক ধরা। যে-আমি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, অথবা যে-আমি জ্ঞানস্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ-অর্থাৎ pure subject বা subjectivity—সে অবশ্যই দৃশ্য বা বিষয়রূপী এই জগতের প্রতিটি জিনিষের এবং সমগ্র জগৎটার বাইরে, অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ থেকে একান্ত ভিন্ন। কারণ, সেই তো সমগ্র এই জগৎটাকে তার সামনে রয়েছে বলে দেখছে। আর, যদি সে জ্ঞানমাত্র বা চিন্মাত্র (cosnciousness-in-itself) হয় তাহলেও সে সমভাবেই জগৎ-এর বাইরে, জগৎকে transcend করে, রয়েছে, কেননা এই চিৎই তো সমগ্র জগতের এবং জগদন্তর্গত প্রতিটি জিনিষের প্রকাশক। সমগ্র জগৎ এবং তদন্তর্গত প্রতিটি জিনিষ এই চিৎ-এর **বিষয়** (প্রকাশিতব্য=object), যে-প্রেক্ষিতেই এ নিজে **বিষয়ী** (প্রকাশক=subject); কূটস্থ রূপে কিন্তু এ হল প্রকাশস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। আগুনকে যেমন অন্য কোনও জিনিষ প্রকাশ করে না, আগুন স্বধর্মেই আত্মপ্রকাশ, আলোকে প্রকাশ করবার জন্য যেমন অন্য কোনও আলোর প্রয়োজন হয় না, আলো নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে থাকে, চিৎ অথবা চিদ্রূপী 'আমি' বা আত্মাও সেইরূপ স্বপ্রকাশ—সে আর সব জিনিষ বিষয়াকারে প্রকাশ করে, কিন্তু নিজে প্রকাশস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। 'স্বপ্রকাশ' পদের অর্থ এই নয় যে, আত্মা বা চিৎ নিজেই (প্রকাশক হিসাবে) নিজেকে (প্রকাশ্য বিষয় হিসাবে) প্রকাশ করে; নিজের আধখানা প্রকাশক ও আধখানা প্রকাশ্য—অদ্বৈতবেদান্ত মতে এটা অবাস্তব কল্পনা, পুরোটাই একই সময়ে একই সঙ্গে প্রকাশক ও প্রকাশ্য, এ কল্পনা আরও অবাস্তব। অতএব, একমাত্র অর্থ হল আত্মা বা জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ; এরই অপর নাম চিতের স্বপ্রকাশত্ব।

কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি এত সহজস্বীকৃতব্য নয়। ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসার আপত্তি তো আছেই, অন্য অনেক বেদান্তীও এবং জগদতিক্রান্তি ব্যাপারে বেদান্তীদের সমগোত্রীয় শৈবেরাও এত সহজে সন্তুষ্ট হবার পাত্র নন। প্রথমে ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসার কথা ধরা যাক।

ন্যায়বৈশেষিকপন্থী আপত্তি করবেন—আলো একভাবে স্বপ্রকাশ হলেও জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য তো বটে। বাইরে সত্যসত্যই কোনও আলো আছে কিনা, একমাত্র জ্ঞানই তার প্রমাণ, জ্ঞানই সে-কথা জানতে পারে। অর্থাৎ, আলোকেও প্রকাশ করে জ্ঞান, আলো জ্ঞানেরও বিষয়। অতএব, আলোর সমতুল হলে যে-কোন জ্ঞানকেও তো এইভাবে অন্য জ্ঞানের বিষয় বলা যেতে পারে। ন্যায়বৈশেষিকপন্থী তো এই কারণেই বলেন যে, যে-কোন জ্ঞান স্বাত্মভিন্ন কোনও এক 'বিষয়ে'র প্রেক্ষিতে 'বিষয়ী' কিন্তু নিজে অন্য এক বিষয়ী জ্ঞানের বিষয়। [যদিও অদ্বৈতবেদান্তী বা যে-কোন অতিক্রান্তিবাদী ( transcendentalist ) এ-কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবেন।] ন্যায়বৈশেষিকের কাছে কোন বস্তুই জগতের বাইরে নয়, সবই জ্ঞেয় এবং অভিধেয়, অর্থাৎ সবই কোন-এক জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। কিন্তু আমরা যে-সব অতিক্রান্তিবাদী, পরমার্থবাদী, দার্শনিকের কথা এখানে আলোচনা করছি তাঁরা বলেন যে, সমগ্র দৃশ্য-জগতের, অর্থাৎ বিষয়-জগতের, প্রকাশ হিসাবে যে জ্ঞান তাকে বহু, অর্থাৎ টুকরা টুকরা বিভিন্ন-বিষয়-প্রকাশ একাধিক জ্ঞান, বলবার হেতু নেই। আত্মারূপ অধিষ্ঠানে উৎপন্ন এ-জাতীয় একাধিক টুকরা টুকরা জ্ঞানরূপ ঘটনাগুলিকে অতিক্রান্তিবাদে চিত্তের বিকার বা বৃত্তি বলা হয়, যে বৃত্তিগুলি এঁদের মতে প্রকাশিত হয় চিত্তাতীত বিশুদ্ধ চিৎ, জ্ঞান বা আত্মকর্তৃক। প্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশক এই চিৎ, জ্ঞান বা আত্মা কোনও ঘটনা নয়, অতএব একাধিক-সংখ্যক নয়। একই চিৎ যাবৎ অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশিত করে। এই transcendental জ্ঞান একাধিক টুকরা টুকরা জ্ঞান নয়, transcendental রাজ্যে একাধিক বিশুদ্ধ জ্ঞান নেই। সাঙ্খ্যযোগে যে একাধিক পুরুষের কথা বলা হয় সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি না, এবং এ-জাতীয় একাধিক চিৎস্বরূপ একাধিক পুরুষ থাকলেও এক পুরুষ বা চিৎ অন্য এক পুরুষ বা চিৎকে বিষয়াকারে প্রকাশ করে না। একাধিক পুরুষের প্রতিটিই স্বপ্রকাশ। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি ব্যষ্টি জীবের চিত্ত নিজের স্পন্দ বা কল্পনারূপ কাজ বন্ধ করা মাত্র পিণ্ডীভূত স্বরূপপরিণামী—অর্থাৎ one dynamic—অজ্ঞানে ( সাঙ্খ্যের ভাষায়

'প্রধানে' ) বিরূপিত হয়। সুষুপ্তি বা সুষুপ্তোপম যোগজ সমাধি অবস্থায় **অপরের থেকে ভিন্ন** 'আমি'র কোনও বোধ থাকে না, তদূর্ধ্ব তুরীয় অবস্থায় কা কথা। অতএব অদ্বৈতবেদান্তে—প্রকৃতপক্ষে সাঙ্খ্যযোগ ব্যতীত যে কোনও অতিক্রান্তিবাদী দর্শনে—অন্তঃকরণের ঊর্ধ্বে, অন্ততঃ অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে, বহু আত্মার অবকাশই নেই। চরমে আত্মা বা চৈতন্য বা জ্ঞান অদ্বৈত। একও বলা যায় না, কারণ এক হল 'বহু'র বিপরীত, 'বহু'র প্রেক্ষিতেই 'একে'র অবকাশ। প্রকৃতপক্ষে, এ-জাতীয় অতিক্রান্তিবাদে চরমতত্ত্ব এক ও বহু উভয়েরই অতীত, অদ্বৈত তত্ত্ব মাত্র। তবে **সাধনপথে** বহু'র বিপরীত রূপে এক বলে একে ধরলে কোনও ক্ষতি নেই। চরম বোধে আত্মা বা ব্রহ্ম সর্ববর্ণনার অতীত।

যাই হোক, চরম জ্ঞান, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ, বহু নয় বলে এই জ্ঞানের অন্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হবার কথাই নেই। চরম জ্ঞান স্বপ্রকাশ। আবার, যেহেতু অদ্বৈতবেদান্ত মতে চরমজ্ঞান ও স্বরূপে লব্ধ আত্মা একই জিনিষ, অতএব এই কূটস্থ আত্মাও স্বপ্রকাশ।

ন্যায়বৈশেষিক ও সাঙ্খ্যমতের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তমতের পার্থক্য কোথায়, তা দেখান হল। Non-transcendental মীমাংসা মতে আত্মা, জ্ঞান ও বিষয়, এই তিন পদার্থই জগতের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ মীমাংসকও ন্যায়বৈশেষিক-মতবাদীর মতো এতদংশে empiricist বা naturalist। ন্যায়বৈশেষিকের মতো মীমাংসা মতেও empirical=প্রাকৃতিক=ব্যবহারিক, তার ঊর্ধ্বে trans-cendental=অপ্রাকৃত=পারমার্থিক বলে ভিন্ন কিছুই নেই। তবুও জ্ঞান ও আত্মার বর্ণন প্রসঙ্গে উভয় দর্শনের মত ভিন্ন। প্রাভাকর মীমাংসা মতে যে-কোন জ্ঞানে একসঙ্গে বিষয়, জ্ঞান ও আত্মা প্রকাশ পায়; বিষয় প্রকাশ পায় বিষয়রূপে, জ্ঞান থাকে স্বপ্রকাশ এবং বহু আত্মার মধ্যে যে-আত্মায় জ্ঞান জন্মাচ্ছে সে আত্মা প্রকাশিত হয় জ্ঞাতা রূপে। ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই মতে জ্ঞান ও আত্মা ভিন্ন—অদ্বৈতীর মতন একই পদার্থ নয়, অথচ জ্ঞান স্বপ্রকাশ। ভাট্ট মীমাংসা মতেও আত্মা ও জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন এবং প্রতি জ্ঞানে বিষয় বিষয়রূপে এবং আত্মা 'আমি'রূপে প্রকাশিত হলেও, অর্থাৎ জ্ঞান আত্মাকে 'আমি'রূপে ও বিষয়কে বিষয়রূপে প্রকাশিত করলেও; নিজে স্বপ্রকাশ ভাবেই হোক বা যে-কোন ভাবেই হোক প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হয় না। 'জ্ঞান' নামক কিছু একটা কাজ যে হয়েছে সেটা কেবল অনুমানলভ্য ( ইংরাজিতে inferable )।

ভাট্ট ও প্রাভাকর উভয় মতেই আত্মা সম্বিৎস্বরূপ। এই সম্বিৎ ও জ্ঞানের

মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞান ক্রিয়াবিশেষ—চেতন-ক্রিয়া, চিৎ-ক্রিয়া কিন্তু সংবিৎ কোন ক্রিয়াই নয়। আত্মাকে যে জ্ঞান-কর্তা বলা হয়েছে তার কারণ এই যে, সম্বিৎস্বরূপ আত্মা জ্ঞানক্রিয়ার আশ্রয়। নৈয়ায়িকও আত্মাকে জ্ঞানগুণের আশ্রয় বলেছেন, কিন্তু আত্মাকে সম্বিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ বলেন নি। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নাদির ন্যায় জ্ঞান আত্মার বিশেষগুণ ( ক্রিয়া নয় ) হলেও আগন্তুক গুণ। মুক্তি অবস্থায় এই গুণ ( কোনও বিশেষগুণই ) আত্মাতে থাকে না। তথাপি নৈয়ায়িক মুক্ত আত্মাকে, সর্ববিশেষগুণহীন আত্মাকে, চেতন বলেছেন। যুক্তি দুর্বল মনে হয়। তাঁরা বলেন আত্মায় চিরকালই **জ্ঞানযোগ্যতা** আছে, অর্থাৎ উপযুক্ত কারণসমাবেশে আত্মায় এই গুণ জন্মে। কিন্তু মুক্তির পর তো আর এই কারণসমাবেশও ঘটবে না। তথাপি তাতে জ্ঞানযোগ্যতা আছে বলতে হবে কোন্ যুক্তিতে? এককালে কারণসমাবেশে তাতে জ্ঞান জন্মেছিল, এটাই কি চেতনত্বের মাপকাঠি? অথবা, জ্ঞান আত্মার **বিশেষ** গুণ—এটাই মাপকাঠি? দুই বিকল্পই দুর্বল—কোনটিই জুৎসই মনে হচ্ছে না। আর, মুক্ত আত্মার এরূপ জ্ঞানযোগ্যতা আছে, অথবা পূর্বে জ্ঞান ছিল—এসব কথা বলে লাভই বা কী হচ্ছে?

মীমাংসা মত কিন্তু এদিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল নয়, কারণ মীমাংসক আর সকলের মতোই আত্মাকে সম্বিৎস্বরূপ বলেন। সংবিৎ ও জ্ঞানের stuff ( উপাদান ) একই—প্রভেদ এই যে, জ্ঞান একটি ক্রিয়া, কিন্তু সম্বিতাংশে চিৎ স্থিতিশীল। তথাপি, নৈয়ায়িকের মতো এঁরাও প্রতি জ্ঞানকে সংখ্যাগত ভাবে ভিন্ন বলেন, এবং সর্বজ্ঞানসাধারণ কোনও স্বরূপতঃ এক-জ্ঞান মানেন না। তাছাড়া, এঁদের মতে প্রতি আত্মাই অপর আত্মা থেকে সংখ্যাতঃ ভিন্ন, এবং সর্ব-আত্মা-সাধারণ কোনও এক-আত্মা নেই। আর, সংবিৎ-স্বরূপ ছাড়া আর সবই—এমন কি, জ্ঞান ক্রিয়াও—মিথ্যা, একথা তাঁরা চিন্তার মধ্যেই আনবেন না।

এ-সব দিক থেকে বিবেচনা করলে অদ্বৈত শৈবমতই অদ্বৈতবেদান্তের সব চেয়ে কাছাকাছি—এমন কি কয়েকটি দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। অদ্বৈত-শৈব মতে শিব স্বরূপতঃ চিৎ-স্বরূপ, কিন্তু বিমর্শ ( self-consciousness ) অবস্থায় তার সঙ্গে সামরস্য ( শিবই শক্তি এবং শক্তিই শিব—এই ভাবে ) সম্পর্কে একীভূত হয়ে থাকে চিৎ-**শক্তি** ( consciousness as a pure function, pure act )। এরই নাম পরা বা আদ্যা চিৎশক্তি[১]।

১। পরে দেখান হবে, এরই নাম পরাবাক্, পরবর্তী ধাপের শক্তির নাম পশ্যন্তী বাক্, তারপরে আছে মধ্যমা বাক্ এবং তারও পরে বৈখরী বাক্।

এই আদ্যা চিৎ-শক্তি কিন্তু বিষয়াভিমুখী নয়, এই শক্তি স্বাভিমুখী, যে 'স্ব' এখানে চিৎ-স্বরূপ শিব স্বয়ং। শিবকে শক্তির 'স্ব' বলতে, অথবা শক্তিকে শিবের 'স্ব' বলতে, কোনও বাধা নেই, কারণ এদের সম্পর্কই যে সামরস্য— একই জিনিষ চিৎ বা শিবরূপে আত্মস্থ, কূটস্থ, এবং শক্তিরূপে চিৎ-ক্রিয়া। এই চিৎ-ক্রিয়া 'স্বা'ভিমুখী হয়ে নিজেকেই (অর্থাৎ শিবকেই, অথবা শক্তিকেই) প্রকাশ করে—শক্তিরূপী চিৎ শিবরূপ চিৎস্বরূপকে, অথবা শক্তিরূপী-চিৎ-মাধ্যমে শিবরূপী-চিৎ নিজেকে, দেখে। এই ব্যাপারটাই অদ্বৈতবেদান্তী একটু বেশি সহজ করে ফেলেছেন। আদ্যা শক্তি বলতে তাঁরা মায়া বা অজ্ঞান-শক্তিকেই বোঝেন, যে-শক্তি তাঁদের মতে স্বতঃই বিষয়মুখী, যেহেতু বিষয়োপস্থাপক, যদিও এই শক্তি এবং এর দ্বারা উপস্থাপিত যা-কিছু সবই শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে মিথ্যা। কিন্তু শৈব-অদ্বৈতী তো নিম্নতম একটি ধাপ ছাড়া আর কোনও ধাপেই শক্তিকে বা শক্তিদ্বারা উপস্থাপিত বস্তুনিচয়কে মিথ্যা বলেন না।

যাই হোক, প্রথম ধাপ-স্থ আদ্যা চিৎশক্তি চিৎস্বরূপ শিবকে প্রকাশ করে। তৎপূর্বে কূটস্থ চিতের কোনও আত্মসংবেদন ছিল না, যদিও ওটা ছিল চিৎস্বরূপ। ইংরাজি ভাষায়, ওটা ছিল consciousness-in-itself, not consciousness as subjective (বিষয়ী)। বিষয়ী-চিতের ধর্ম তিনটি—(১) আপন স্বভাবেই শুদ্ধ বিষয় উপস্থাপিত করা, অর্থাৎ একান্ত-স্বাভাবিক বিষয়াভিমুখিতা, (২) এই ভাবে উপস্থাপিত যে-বিষয়কে অজ্ঞানবশতঃ (ভুল করে) চিৎ-নিরপেক্ষ স্বরূপসৎ বলে ব্যাবহারিক দশায় মনে করা হয়েছিল তা থেকে সরে আসা, অর্থাৎ তাকে একান্ততঃ চিৎসাপেক্ষ বলে দেখা (এরই নাম 'স্বভাবতঃ বিষয়প্রকাশশীলতা', 'বিষয়প্রকাশোন্মুখিতা', তা কোনও বিষয় থাকুক বা না থাকুক—ইংরাজি ভাষায় reference *sui generis*), এবং (৩) চিৎ-স্বরূপকে (বিষয়কে নয়) প্রকাশ করা, যারই অপর নাম বিমর্শ (ইংরাজিতে self-consciousness)। শৈব-অদ্বৈতীর মতে চিতের স্বপ্রকাশিতত্ব, অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা চিৎস্বরূপ প্রকাশিত হওয়া, হল চিৎস্বরূপাবস্থার পরে প্রথমতম ধাপ, যার নাম আদ্যা শক্তি। তারপরের ধাপে শক্তি বিষয়-মহাসামান্য (object-in-general)=মহা-'ইদম্' নিজের, অর্থাৎ বিমর্শযুক্ত শিবের, সামনে উপস্থাপিত করেন। উপস্থাপিত করতে চাওয়ার নাম ইচ্ছা, উপস্থাপিত হয়েছে—এই বোধের নাম 'জ্ঞান', এবং উপস্থাপিতের আরও ক্রমবিশেষী-করণের নাম 'ক্রিয়া'। এই ভাবে অনেক কিছু করার পর আসে 'মলিন মায়া' বা অজ্ঞানের ধাপ, যখন উপস্থাপিত বিষয়কে চিৎ-নিরপেক্ষ, স্বনির্ভর, মনে করা

হয়। শৈব অদ্বৈতী এই ভাবে অদ্বৈতবেদান্তের ত্বরিত-সিদ্ধান্তগত অনেকগুলি লুকান ধাপ প্রকাশ করে বিষয়টি সহজবোধ্য করেছেন।

বহু আত্মা বনাম ব্রহ্মরূপ একমাত্র আত্মা সম্বন্ধেও অদ্বৈতশৈবমত উদারতর। চরমে, অবশ্যই, সব আত্মা মূলে এক শিব বা আত্মশক্তি। কিন্তু যে-ধাপে 'ইদং' উপস্থাপিত হয়েছে সেই ধাপেই মহামায়া অসংখ্য অণু-আত্মাও উপস্থাপিত করেছেন—বিষয় আকারে নয়, বিষয়ী আকারেই; এবং বিষয় সেখানে ঐ 'ইদম্' অর্থাৎ বিষয়-মহাসামান্য। এই অসংখ্য অণু-আত্মা উপস্থাপনের প্রয়োজন এই: অদ্বৈতী শৈবের কাছে বিষয়মাত্রই যেহেতু মিথ্যা নয়, অতএব সৎ-বিষয়ের সত্যত্বের বা সত্তার মাপকাঠিও ঠিক করতে হবে। যদি বিষয়টি চিৎ-নিরপেক্ষ হয়ে স্ব-মহিমায় থাকতে পারত, তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যেত। কিন্তু এখনও চিৎ-নিরপেক্ষতার ধাপ আসেনি, এবং এই শৈবদের মতে চিৎ-নিরপেক্ষ বিষয় মিথ্যা। তাহলে সৎ-বিষয়ের লক্ষণ কী হবে? একমাত্র লক্ষণ: উপস্থাপিত বিষয় বহু অণু-আত্মার কাছে (একই ভাবে) বিষয়রূপে উপস্থাপিত থাকে। প্রতি অণু-আত্মাই পূর্ণশিবের পূর্ণতা অক্ষুন্ন রেখেও 'বহু'রূপে আত্মসংকোচন। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে: 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'।

সহজেই প্রশ্ন হতে পারে চিৎ-নিরপেক্ষ বিষয়ের সদ্বস্তু হতে বাধা কোথায়? এ-প্রশ্ন অন্য দিক থেকে যতই সঙ্গত হোক না কেন, যে-সব অতিক্রান্তিবাদী স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়-সৃষ্টিকে বুঝতে চান তাঁরা empiricist-দের এই প্রশ্নকে কোন আমলই দেবেন না। এবং আমরা বর্তমানে অতিক্রান্তি-বাদেরই আলোচনা করছি। অতিক্রান্তিবাদ—অর্থাৎ পারমার্থিক ও ব্যাব-হারিকের মৌল ভেদ স্বীকারের যুক্তিগুলিও আমরা দেখেছি।

একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। অতিক্রান্তিবাদীদের সকলেই অদ্বৈতী নন, এমন কি কোনও ভাবেই দ্বৈতাদ্বৈতীও নন। তাঁদের মধ্যেও অনেকে খোলাখুলি ভাবে দ্বৈতী। তবুও empiricist দ্বৈতীদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে এঁরা সকলেই চিৎ বা চিৎশক্তি ছাড়া আর সব তত্ত্বকেই তাদের কার্যধারার দিক থেকে ঐ চিৎ বা চিৎশক্তির উপর নির্ভরশীল করেছেন।

অদ্বৈতবেদান্তমতটি পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য তদ্বৈপরীত্যে empirical ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসা এবং transcendental সাংখ্যযোগ ও শৈব মতের কিছুটা আলোচনা করা হল। মহাযান মতে আত্মা বলে স্থিতিশীল কোন পদার্থই নেই। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা এবং চিদ্রূপ বিশুদ্ধ-জ্ঞান একই চিরস্থির

চিরসৎ পদার্থ, যা-কিছু অস্থির এবং অচিরসৎ ( অর্থাৎ অননুগত ) তা সমস্তই অজ্ঞান বা অজ্ঞানপ্রসূত। মহাযান ( ও কিছু অংশে শৈব ) মতে এই চিদ্রূপ বিশুদ্ধজ্ঞান কেবল-শক্তিস্বরূপ, এবং শক্তি বলেই চিরচঞ্চল এবং স্বরূপে, অর্থাৎ চিরস্থির ব্রহ্ম ( বা শিব ) ব্যতিরেকে, 'ন সৎ ন-অসৎ', অর্থাৎ অগ্নি ব্যতিরেকে দাহিকা শক্তিমাত্র যেমন শক্তিরূপে চির dynamic এবং তাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, তদ্রূপ। যে ধর্ম অদ্বৈতবেদান্তী অজ্ঞান বা মায়া-শক্তিতে দেখেন মহাযানী সেই ধর্ম চিৎ-শক্তিতে দেখেন। অদ্বৈতী শৈবও কিয়দংশে এ-কথা স্বীকার করেন। অদ্বৈতী শৈব এবং মহাযানীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, অদ্বৈতী শৈব চিরস্থির চিৎ-স্বরূপ কূটস্থ অনুত্তর শিবও স্বীকার করেন এবং এই চিরস্থির চিরসৎ অনুত্তর শিবের সঙ্গে চিরচঞ্চল ন-সৎ ন-অসৎ, অর্থাৎ indefinite unpositable, চিৎ-শক্তির সামরস্য স্বীকার করেন; পক্ষান্তরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ চির-অস্থির চিত্তপ্রবাহেরও পশ্চাদ্‌বর্তী এক indefinite unpositable মূর্তিমান চঞ্চলতা ( dynamism )-স্বরূপ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাকেই চরমতত্ত্ব বলেন, যদিও চিরচঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ওটাই অনুত্তর; এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন যে, চরম তত্ত্ব হল 'ন-সৎ ন-অসৎ ন-সদসৎ ন নিঃসত্ত্বাকসত্ত' চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত নির্বাণ রূপ চরম indefinite dynamism।

মোট কথা, সাঙ্খ্যযোগ, অদ্বৈতবেদান্ত, অদ্বৈত শৈব ও মহাযানী বৌদ্ধ, এঁরা সকলেই বিশুদ্ধ চিৎকে—তা সেই চিৎ চিরস্থির চিৎস্বরূপই ( consciousness-in-itself ) হোক অথবা চিরচঞ্চল চিৎশক্তিই ( consciousness as subjective act of *sui generis* positing or withdrawal ) হোক—স্বয়ংসম্পূর্ণ এক চরমতত্ত্ব বলে মনে করেন। সেইজন্যই তাঁরা সমগ্র জগৎকে এক লপ্তে অনুভব করতে পারেন, অন্ততঃ এ-জাতীয় অনুভবের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন। অতএব, সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে সামগ্রিক ভাবে কিছু বলা, এমন কি সামগ্রিক ভাবে একে মিথ্যা বলার, মধ্যেও কোনও প্রকার স্ববিরোধ বা অসম্ভাব্যতা নেই।

তবুও প্রশ্ন উঠতে পারে, মিথ্যা বলবার স্বপক্ষে যুক্তিই বা কোথায়? এইখানেই, অর্থাৎ এই প্রশ্নের উত্তরেই, অদ্বৈত বেদান্তীর অভিনবত্ব।

উত্তরটি এই :—

বিশুদ্ধ চিৎকে চরমতত্ত্ব বললে, হয় জগৎকে অন্য একটি চরম তত্ত্ব বলে স্বীকার করতে হয়, না-হয় জগৎকে অ-তত্ত্ব বা মিথ্যা বলতে হয়। জগৎকে

অন্য একটি চরম তত্ত্ব বলা যায় না, কারণ তাহলে চিৎ-রূপ চরম তত্ত্ব ও জগৎ-রূপ চরম তত্ত্বের মধ্যে ঠিক কী-সম্বন্ধ তা নির্ণীত হয় না এবং তথাকথিত 'জগৎরূপ চরম তত্ত্ব' বলতে কী বোঝায় তাও ঠিক ঠিক ধরা যায় না। 'চরমতত্ত্ব' শব্দের অর্থই হল যা নিজ স্বরূপে চির বর্তমান থাকে। অবশ্য, তাকে যে চিরস্থির হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, কারণ চিরচঞ্চল চিৎ-শক্তিও চরম তত্ত্ব। কিন্তু 'জগৎ' বলে কোনও একটা জিনিষ বরাবর একই স্বরূপে অপরিবর্তিত রূপে বর্তমান থাকে না। জগতে নিত্যই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, একটি জিনিস অন্য একটি জিনিষে পরিবর্তিত হচ্ছে, অথবা অন্য একটি জিনিষকে স্থান দেবার জন্য নিজে বিলুপ্ত হচ্ছে, অথবা কিছুটা নিজ স্বরূপে থেকেও কিছুটা পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনও ক্ষেত্রেই জগৎ বা জগৎস্থ কোন জিনিষই অপরিবর্তিত থাকে না, কেবলস্বরূপে চিরকাল বজায় থাকে না; আর নিজ স্বরূপের কিছুটা বজায় থাকবে কিছুটা থাকবে না—একথার কোনই অর্থ হয় না। স্বরূপ সমগ্র ভাবেই স্বরূপ। তার আধখানা বজায় থাকবে, আধখানা থাকবে না, এ প্রকার অর্ধজরতী ন্যায় অচল। শক্তির স্বরূপগত চাঞ্চল্য কিন্তু স্বরূপের পরিবর্তন নয়। একে 'পরিণাম' বললে সেই পরিণাম সাঙ্খ্যের প্রকৃতিগত সরূপ-পরিণামের মতোই। সরূপ-পরিণাম=dynamism।

অতএব চিরপরিবর্তনশীল এই জগৎ একটি চরম তত্ত্ব হতে পারে না। তাহলে তো বলতেই হবে এই জগৎ চরম তত্ত্ব আত্মা বা ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, আত্মা বা ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্ট। আত্মা বা ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট হওয়ার সাধারণ অর্থ, জগৎ আত্মা বা ব্রহ্মের পরিণাম, যেমন অলঙ্কার একখণ্ড সোণার পরিণাম, যেমন একটি টেবিল একখণ্ড কাঠের পরিণাম। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তী এখানে বলেন যে, কোনও চরমতত্ত্বের এ-জাতীয় পরিণাম বা পরিবর্তন হয়েছে, এ-কথা বলা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হবে না; কারণ কোনও বস্তু এভাবে পরিবর্তিত হলে আর সে সে-বস্তু থাকে না। অন্ততঃ চরম তত্ত্বের এ-জাতীয় পরিণামের কথাই স্ববিরুদ্ধ। চিরস্থির চির-স্ব-স্বরূপ চরমতত্ত্বের স্বরূপের পরিবর্তন হওয়ার কোন অর্থই হয় না।

চিরস্থির চরমতত্ত্বের এ-জাতীয় পরিণাম না হতে পারে কিন্তু চিৎশক্তি-রূপ চির-চঞ্চল চরমতত্ত্বের এ-জাতীয় পরিণাম হতে বাধা কোথায়? 'চির-চঞ্চল' শব্দের অর্থই হল সেই জিনিষ যার বিশুদ্ধতম অবস্থায়ও সরূপ-পরিণাম চলে। তাই শৈবাদি সম্প্রদায় চিৎশক্তির 'পরিণাম'ই মানেন, অদ্বৈতবেদান্তীর 'বিবর্ত' এখানে স্বীকার করেন না। শৈবের এটুকু কথা স্বীকার করে নিতে কিন্তু

অদ্বৈতীর এতটুকু দ্বিধা নেই। তিনিও 'অজ্ঞানে'র পরিণাম স্বীকার করেছেন। তাঁর বাড়তি কথা এইটুকু যে, এই অজ্ঞান মিথ্যা। তাঁদের সত্যস্বরূপের পরিণাম হয় না, তা সে-পরিণাম সরূপ পরিণামই হোক, অথবা বিরূপ পরিণামই হোক।[১]

অদ্বৈত-বেদান্তীর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে, সত্য স্বরূপের সত্য পরিবর্তন না হোক, মিথ্যা (apparent) পরিবর্তন, মিথ্যা সৃষ্টি, তো হতে পারে। অদ্বৈত-বেদান্তী প্রথমে উত্তর দেবেন—তাহলে তো ফলতঃ জগৎকে মিথ্যা বলাই হল। অবশ্য, এই আপত্তির গূঢ় অভিপ্রায় অনেক অদ্বৈতী ধরতে পারেন না। গূঢ় অভিপ্রায় হল এই যে, সত্যই হোক, মিথ্যাই হোক, আত্মা বা ব্রহ্ম থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, একথা তো মানতেই হবে, এবং দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা বস্তুও তো এক রকম বস্তু। মিথ্যা সাপও আমি দেখেছি, মিথ্যা স্বপ্নও তো দেখেছি। কিন্তু কঠোর অদ্বৈত-বেদান্তীর বক্তব্য—বিশেষ করে গৌড়পাদ ও কারিকাভাষ্যকার শঙ্করের উত্তর—এখানে অতি পরিষ্কার। তাঁদের বক্তব্য হল, সৃষ্টিকে মিথ্যা বলার অর্থই হল প্রকৃত পক্ষে এই সৃষ্টি ঘটে নি, শুধু মনে হচ্ছে—অথবা মনে হয়েছিল—**যেন** ঘটেছে: কেবল সাপটা নয়, মিথ্যা সাপের উপস্থাপন ঘটনাটাও নিছক **যেন**-একটা-ঘটনা। প্রকৃত ঘটনা নয়। রজ্জুখণ্ড থেকে প্রকৃত কোন সর্প-সৃষ্টি হয় নি। সাপটাও যেমন যেন-সাপ, **যেন-মনে-হচ্ছে**-সাপ—যে সাপ প্রকৃত রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে কোনও কালে ছিল না, এখনও নেই এবং কোনও কালে থাকবেও না-ঠিক তেমনই বলা যেতে পারে যে যদিও মনে **হয় রজ্জু থেকেই** এই সর্পের সৃষ্টি হয়েছিল, রজ্জুটাকেই সাপ বলে দেখেছিলাম, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এরূপ সৃষ্টি, রজ্জুর এরূপ পরিণাম, অর্থাৎ সর্পরূপে মিথ্যা পরিণাম, ঘটেই নি। জগৎ-ও, সেইরূপ, সৃষ্ট হয় নি, তা সে সত্য সৃষ্টিই হোক, অথবা মিথ্যা সৃষ্টিই হোক। মিথ্যা ব্যাপার সত্যের পাশাপাশি সমান জোরে থাকে না, থাকতে পারে না। যতক্ষণ কেবল মিথ্যাকে দেখি ততক্ষণ সেটা একটা বস্তু, কিন্তু যেই তার সত্য

১। একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। অদ্বৈত-শৈবমতে আত্মা চিৎশক্তির সরূপ পরিণাম হলেও মহামায়ার ধাপে ধাপে—এমন কি মায়া ও প্রকৃতির রাজ্যেও—বহু সত্য বিরূপ-পরিণাম হয়। ইংরাজিতে একেই বলে phenomenological intention বা a *priori* positing of *pure possible objects*।

স্থূল, সত্য অধিষ্ঠান, দেখি অমনই মিথ্যাও লুপ্ত হয়, অন্ততঃ সত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিথ্যা সমান জোরে স্বীকৃতি দাবি করতে পারে না। তার কারণটা হল এই যে, মিথ্যা জগৎটা সত্য জগতের মধ্যে আছে, অথবা সত্য জগৎটা মিথ্যা জগতের মধ্যে আছে, অথবা সত্য ও মিথ্যা উভয় জগৎই অন্য কোন এক বিশালতর জগতের মধ্যে আছে—এ-জাতীয় কোন কথাই বলা যায় না, এ-জাতীয় কোন কথার কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না।

আরও অগ্রসর হয়ে বলা যায়, যে-আমি মিথ্যা সাপকে সত্য সাপ মনে করে ভয় পেয়েছিলাম সেই আমিটা-ও স্বপ্নদ্রষ্টা আমি এবং স্বপ্নে দৃষ্ট অন্যান্য জীবগুলির মতোই মিথ্যা ছিল। স্বপ্নান্তে জাগরিত অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার, এমন কি স্বপ্নদৃষ্ট অন্যান্য জীব এবং স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে উপলব্ধ স্বপ্নদ্রষ্টা আমিও, সামগ্রিক ভাবে মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থায় কেবল স্বপ্নকালাবচ্ছেদে যেমন সমগ্র স্বপ্ন জগৎটা কেবল স্বপ্নদ্রষ্টা মিথ্যা-আমির কাছেই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল তদ্রূপ সমগ্র জাগ্রৎ জগৎটাও সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে যে জাগ্রদবস্থ জীব এই জগৎটা দেখছে কেবল তারই কাছে। জগৎ যদি মিথ্যা হয় তাহলে ঐ জাগ্রদবস্থ জীবও সমান মিথ্যা।[১] উভয় ক্ষেত্রেই সত্য বস্তু হল শুদ্ধ আত্মা, যে-আত্মা অজ্ঞানদুষ্ট হয়ে অজ্ঞানপরিণাম চিত্তরূপ সূক্ষ্মভূতে, এবং স্থূলবিশেষে, অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায়, অধিকন্তু স্থূলভূতে—বা স্থূলদেহধারী জীবরূপী 'আমি' আকারে—প্রতিভাত হয়। এই প্রতিভাত মিথ্যা 'আমি'র কাছেই জাগ্রদবস্থ জগৎ সত্য বলে মনে হয়, নিজেকেও সত্য সত্যই চিত্তদেহধারী জীব বলে মনে হয়। আবার এতৎ সত্ত্বেও মেঘের আড়ালে বর্তমান প্রকাশরূপী সূর্যের যেমন কিছুটা প্রকাশ আমরা বরাবরই দেখি, তদ্রূপ সমস্ত অজ্ঞানাবরণ ও তার সূক্ষ্ম ও স্থূল বিক্ষেপ সত্ত্বেও শুদ্ধ স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ আত্মার কিছুটা বোধ সর্বাবস্থাতেই আমাদের থাকে, এবং ঠিক যতটা অংশে এই শুদ্ধ স্বপ্রকাশ আত্মার বোধ থাকে ঠিক ততটা অংশেই জীব ও জগৎ মিথ্যা অবাস্তব মনে হয়।

জীব ও জগতের সত্য সৃষ্টি তো হয়ই নি, মিথ্যা সৃষ্টিও হয় নি। মিথ্যা

---

১। আগেই দেখান হয়েছে, এবং অদ্বৈতবেদান্তী আবার দাবি করবেন যে, স্বপ্নকালীন স্বপ্নদ্রষ্টা 'আমি'ও মিথ্যাসর্পদর্শনকালীন মিথ্যাসর্পদ্রষ্টা 'আমি' ( সমভাবে ) মিথ্যা এই কারণে যে, এই উভয় 'আমি'কেই জাগ্রৎ জগতের দ্রষ্টা ( আপাতগৃহীত সত্য ) 'আমি'র সঙ্গে কোনও সঙ্গত ভাবে সম্পর্কিত করা যায় না।

সৃষ্টি হয় নি এই অর্থে যে, মিথ্যা-সৃষ্টি বলে প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় কোনও প্রকার সৃষ্টিই থাকতে পারে না। তদ্রূপ আত্মজ্ঞানোদয়ে জগৎ, জগতের জ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞাতা রূপ জীবের অপলাপও ঘটে না, তা সেই অপলাপকে সত্য রূপেই ধরা হোক অথবা মিথ্যারূপে ধরা হোক। কোনও কালে যেমন এই জগতের ও জাগতিক যে-কোনও ব্যাপারের সত্য সত্যই সৃষ্টি বা অপলাপ হয় নি তদ্রূপ কোনও কালে এদের মিথ্যা সৃষ্টি বা মিথ্যা অপলাপ, অর্থাৎ নিরন্বয় বিনাশ, হয় নি বা হবে না। এই হল মিথ্যার তত্ত্ব। গৌড়পাদ এরই নাম দিয়েছেন অজাতিবাদ। চরম তত্ত্ব হল বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মা (পরমাত্মা) বা ব্রহ্ম, এবং একমাত্র তিনিই চরম তত্ত্ব। তাঁর থেকে কিছুই জন্মায় নি, অর্থাৎ তাঁর জগদাদিরূপ কোনও বিকার, সত্যতঃ বা মিথ্যাতঃ কোন ভাবেই, হয় নি। তবুও যে এই জগৎ দেখি এবং জগৎ-বিষয়ক আমার প্রতীতি হয়, এমন কি জগৎদ্রষ্টারূপে নিজেকে অনুভব করি—এসবই চরমতত্ত্ব পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একান্ত-অসম্বন্ধ মহাশূন্যে ভাসমান প্রতিভান মাত্র। এর আদি, অন্ত ও স্থিতি সবই প্রহেলিকা, সবই ইন্দ্রজাল। কেমন করে হচ্ছে, কেনই বা লোপ পাচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না।

আমাদের জীবনেতিহাস সুরু হয় এই প্রহেলিকার মধ্যেই। সুরু কবে হয়েছে জানা নেই—পূর্ব পূর্ব জন্ম-ধারা স্বীকার করলে এই ধারাকে অনাদিই বলতে হবে। কিন্তু এই অনাদি জীবনধারা পুরোপুরি এই প্রহেলিকা জগতেরই ব্যাপার। এ জগৎটা আদ্যন্ত মিথ্যা, এই মিথ্যা জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মিথ্যারূপে যে-জীব বর্তমান সেই মিথ্যা জীব মুক্তির অব্যবহিত পূর্বাবস্থা পর্যন্ত যেহেতু একান্ত স্বতন্ত্র আত্মাকে যথার্থভাবে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যেহেতু নিজেকে জীব রূপে বুঝে বহুলাংশে এই মিথ্যা জগতের বশে চলার ফলে বহু দুঃখভোগ করে, এবং যেহেতু ঘন মেঘাবৃত সূর্যের মতো বিক্ষেপবৎ-অজ্ঞান কর্তৃক আবৃত চিৎস্বরূপ আত্মা নিজেকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত রাখে, তাই সেই স্বতন্ত্র চিৎস্বরূপ আত্মাকে হাতেনাতে পাবার ইচ্ছাও সেই জীবের চিত্তে জাগরূক হয় এবং নানাবিধ জ্ঞানসাধনের দ্বারা সে অজ্ঞানজাল বিদীর্ণ করতে উদ্যত হয়। এই আত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা ও সমগ্র জ্ঞানসাধন (ও তদবান্তর অন্যান্য যাবৎ সাধন)—সবই কিন্তু সমান মিথ্যা। এই সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকলে অবশ্যই প্রতিভাত হয় ধীরে ধীরেই হোক, অথবা ঠিক প্রাক্-মুক্তি অবস্থায় সহসা সামগ্রিক ভাবেই হোক, অজ্ঞান নিঃশেষে অপনোদিত হল। এই অপনোদনও সমান মিথ্যা। মিথ্যা জগতের মিথ্যাত্ব বোধও সমান

মিথ্যা।[১] এই সব মিথ্যার সঙ্গে আত্মোপলব্ধির সরাসরি কোনও যোগ আছে কিনা, এবং থাকলে কী যোগ, কিছুই আমরা বুঝতে পারি না। অদ্বৈত-বেদান্তমতে তথাকথিত মুক্তিলাভে (যে মুক্তিলাভও মিথ্যাজগতের ব্যাপার) চরমে যে আত্মবোধ হয়, ঐ আত্মবোধ, অর্থাৎ আত্মা নিজে—কারণ, আত্মা বোধস্বরূপ—চিরপ্রকাশ রূপেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, সাধনলব্ধ প্রথম পূর্ণপ্রকাশরূপ যে-ঘটনা 'সেহ বাহ্য', সেও মিথ্যা। পূর্ণপ্রকাশ আত্মা স্বতঃই পূর্ণপ্রকাশ, চিরকালই পূর্ণপ্রকাশ। ব্যাবহারিক জগতে যা-কিছু মিথ্যার জঞ্জাল এই চিরপূর্ণপ্রকাশকে আবৃত রেখেছিল মিথ্যাজগতেই সেই জঞ্জাল নিঃশেষে অপসারিত হয়েছে। আবরক মেঘ যেমন স্বপ্রকাশ সূর্যের স্বরূপে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটায় না এবং ঐ মেঘের অপসারণেও যেমন সূর্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, চিৎস্বরূপ আত্মার ক্ষেত্রেও আত্মার স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থা ঠিক সেই প্রকার। মুক্ত পুরুষ নিজেকে চিরমুক্তই দেখে। সমস্ত ব্যাপারটাই হল 'প্রাপ্তস্য প্রাপ্তিঃ', 'করামলকবৎ', ইংরাজিতে যাকে বলে scales falling off the eye।

মাণ্ডূক্যকারিকা ও শঙ্করের ভাষ্যে মাণ্ডূক্যোপনিষদুক্ত বেদান্তের কথা যে-ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মোটামুটি সেই পথেই আমরা এতক্ষণ বেদান্ত বর্ণনা করলাম। অর্থাৎ দেখাবার চেষ্টা করলাম, স্বপ্নজগতের মতোই এই জাগ্রৎ জগৎ সূক্ষ্মস্থূলদেহবান্ জীবরূপী চিদাত্মার স্থূলদেহ মাধ্যমে চিত্তবিক্ষেপ, চিত্তস্পন্দ, কল্পনা, 'intention' বা construction। স্থূল বা স্থূলোপম সূক্ষ্ম জগতে—অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায়—intention বা construction-এর সর্বদাই কোনও-না-কোন স্থূল বা স্থূলোপম সূক্ষ্মমূর্তি থাকে, যেটা কেবল জীবদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা না করতে পারার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টকে space এবং time রূপ pure *intuition* (construction নয়) মানতে হয়েছিল, এবং আরও মানতে হয়েছিল অব্যাখ্যেয় ঐন্দ্রিয়বোধ (sense-affection) ও তার কারণস্বরূপ অজ্ঞেয় thing-in-itself; হুসার্লকেও বলতে হয়েছিল 'Nature stands bracketed'.। ভারতীয় কোনও অতিক্রান্তিবাদী (transcendentalist) দার্শনিককে এ-জাতীয় হাঙ্গামায় পড়তে হয় নি। তাঁরা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন-জাতীয় construction মেনেছেন, 'given' এর

১। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

ধার ধারেন নি—স্বপ্নে সূক্ষ্ম construction বা কল্পনা, কিন্তু এমন এক জাতীয় সূক্ষ্ম যা কেবল চিত্তে সীমিত থাকে না, যা জাগ্রতের স্থূলভূতের বাসনাবশে তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্মভূতেরও কল্পনা করে ; এবং জাগ্রদবস্থায় চিত্তের এই কল্পনা স্থূলদেহ মাধ্যমেই চলে। জাগ্রদবস্থায় যাঁর চিত্তে এ-জাতীয় কল্পনার খেলা চলে তিনি হলেন বিরাট্ বা বৈশ্বানর—the great cosmic man who comprises each one of us and whose body is all our bodies taken together ; according to some, the whole physical world is his ( gross ) body। এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আমারই অন্ত এক রচনা থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে অজাতিবাদের আর একটা দিক প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করছি :

*Ajativada* means that *jati* ( birth, i e. origination ) cannot belong to anything. The central argument is that 'origination' cannot be predicated of anything. ( To be predicated means to be spoken of as a property of that which stands in that context as the subject ). This is so, because in order that as a property it belongs to something this latter must already be there, and if it is already there before its origination what it all means is that it has not really originated. This reminds us of Kant's criticism of the Ontological Argument. Only, in his case, it was not *origination* but *existence* itself, but the logic in both the cases is the same. And, the reply too would be the same, viz. that the naturalistic ( empirical ) standpoint is to be transcended. Transcendent existence, in other words, is categorially different from empirical existence ; and so is the case with origination too. As the transcendent=trans-empirical is self-existent so is it self-originating too ( both 'existence' and 'origination' being understood in a trans-empirical sense ). Self-origination would then mean 'It originates itself in another form which form, therefore, is not really other than itself'. It is self-transformation and yet what has ( trans-

cendentally ) emerged that way is but that very itself ; i.e. the very itself continues to maintain itself, not only *in* but also *through* itself. This is neither *satkaryavada,* nor *asatkaryavada,* nor necessarily *vivartavada* in the technical sense of the term. Is this not what Kant's *a priori* anticipation or Husserl's 'intentionality' is fundamentally ?

মাণ্ডূক্যকারিকার অপরূপ বৈশিষ্ট্য এই যে, পরবর্তীকালে নব্য অদ্বৈত-বেদান্তীরা নিজেদের মতস্থাপনে যে-সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি প্রদান করেছেন তার অধিকাংশই সরল ভাষায় এই কারিকাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'বৈতথ্য-প্রকরণ' নামক দ্বিতীয় প্রকরণে স্বপ্নের সঙ্গে জাগদবস্থার অতি স্ফুট যে-সব সাদৃশ্য আছে তার অনেকগুলিই হেতুরূপে সন্ন্যস্ত করে গৌড়পাদ স্বপ্নজগতের মিথ্যাত্বের ন্যায় জাগদবস্থাগত জগতের মিথ্যাত্ব অনুমান ( inference ) সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। ন্যায়বৈশেষিক বা মীমাংসামতাবলম্বী কেউই এগুলিকে সৎ হেতু বলে স্বীকার করবেন না। গৌড়পাদ এবং শঙ্কর এত সহজে এগুলিকে সৎ হেতু বলে কেন মনে করলেন—এ-প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে। এর উত্তরও আমরা পূর্বে দিয়েছি। বিবাদের মূলে রয়েছে অন্য একটি প্রশ্ন, যথা **সমগ্র জগৎকে** আদৌ মিথ্যা বলা যায় কি না, এমন কি **সমগ্র** জগৎ সম্বন্ধে আমরা জগদন্তর্গত জীব হয়ে আদৌ সামগ্রিক ভাবে কিছু বলতে পারি কিনা। ন্যায়বৈশেষিক বা মীমাংসামতাবলম্বীরা naturalist (empiricist) বলে এ-জাতীয় কথাবার্তা প্রথম থেকেই বরবাদ করে দিয়েছেন। মিথ্যা সর্পকে মিথ্যা জেনেও তাঁরা জগতের মধ্যেই তার স্থান নিরূপণ করতে চেয়েছেন, এবং তাঁদের কাছে 'জগৎ' মানেই সত্যজগৎ, অর্থাৎ জগদন্তর্গত যাবৎ বস্তুই তাঁদের কাছে সৎ, অতএব মিথ্যা সর্পও যেহেতু জগদন্তর্গত অতএব এও কোনও-না-কোন ভাবে সৎ। অতিক্রান্তিবাদী বা পরমার্থবাদী ( transcendental ) দার্শনিকেরা, যাঁরা আমাদের দৈনন্দিন জগৎকে কোনও-না-কোন ভাবে সাংবৃত্তিক, ব্যাবহারিক, মিথ্যা ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন, তাঁরা মিথ্যা সর্পকে প্রথম থেকেই দৃশ্য জাগ্রৎ জগতের বাইরে স্বপ্নরাজ্যের সমগোত্রীয় করে রেখেছেন। এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে; অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় আলোচিত শব্দ ও অর্থের একত্ব ( identity ) প্রতিপাদন প্রসঙ্গে আমরা দুটি যুক্তির উল্লেখ করে বলেছিলাম কোনটাতেই নিঃসন্দেহে একত্ব

প্রতিপাদিত হয় না। সেই প্রসঙ্গে আমরা আরও বলেছিলাম যে, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার বিশ্লেষণের আলোকে এই ঐক্যের প্রশস্ততর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, শৈব ও শাব্দিক দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষভাবে এবং গৌড়পাদ ও শঙ্কর পরোক্ষভাবে এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই প্রথমে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের চিন্তাপ্রণালীতেই বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

এই ব্যাবহারিক empirical জগতের প্রতিটি দ্রব্য গুণ কর্মাদির যথাযথ conventional নাম আছে। প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা ঐ ভাষাতে কোন্ জিনিষের কী নাম, অর্থাৎ কী নাম কোন্ জিনিষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে, তা ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধজনের ব্যবহার অনুসরণে শেখে। কিন্তু এই জাতীয় নির্দিষ্ট একটা নাম যে কোন-না-কোন-একটি জিনিষের বাচক—এ ব্যাপারটা তাকে ঐ ভাবে empirically শিখতে হয় না। এ-জাতীয় শব্দের যে meaning reference ( অভিধা ) to বাচ্যপদার্থ আছে, এ-জ্ঞান একান্ত সহজাত, *a priori*—চিন্তারই সহজ স্বাভাবিক এক ভঙ্গী। যে-কোন ভাষাগোষ্ঠীর লোকের চিন্তার ও শব্দ-ব্যবহারের মূলেই থাকে এই সহজ reference ভঙ্গীটি। তদ্রূপ, যে-কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তু অন্য এক নির্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে কার্যকারণ কিংবা অন্য কোনও structural সম্বন্ধে সম্বন্ধ কিনা তা জানতে হয় empirically—অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বস্তু যে অন্য কোনও-না-কোন বস্তুর সঙ্গে এ-জাতীয় structural সম্বন্ধে সম্বন্ধ, এ-প্রতীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সব মানুষেরই এই প্রতীতি আছে। আবার, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেমন এই প্রকার *a priori* structural relations আছে, সব ভাষাতেই বিভিন্ন শব্দের মধ্যেও এ-জাতীয় *a priori* structural relations আছে—যাদের বলা হয় fundamental বা in-depth syntax. Meaning reference এবং বস্তুর structural relations এর সহভাবী ও দ্যোতক এই fundamental syntax (depth-structure of language) চিন্তা বা thought বা reason-এর প্রাণ। যে-কোন নির্দিষ্ট ভাষায় বিভিন্ন জিনিষের empirically ব্যবহৃত নামকে বলা যেতে পারে স্থূলতম 'বৈখরী' শব্দ। কিন্তু যে শব্দ বা শব্দরাজি depth-syntax এবং বস্তুগত structural relations এর দ্যোতক সেগুলি ভাষায় বিভিন্ন হলেও তৎ তৎ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে সহজেই চিন্তার আদান-প্রদান চলে। ইচ্ছা করলে এগুলিকে আন্তর্জাতিক প্রতীক চিহ্ন ( international symbols ) দিয়ে

নির্দেশিত করা যায়। এই শাব্দিক প্রতীক-চিহ্নগুলির নাম দেওয়া যেতে পারে 'মধ্যমা শব্দ'। সচরাচর এই মধ্যমা শব্দগুলির স্থূলভাবে—এমন কি, সূক্ষ্মভাবেও—উচ্চারণ করতে হয় না। সত্য বটে, এদের ক্রিয়াকলাপ আয়ত্ত করার জন্য বা এতদেতৎ-বিষয়ক বিদ্যা ( science ) গড়ে তোলার জন্য meta level থেকে এদের উচ্চারণ করবার বা লেখবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এতদেতৎ-বিষয়ঘটিত সাধারণ ( normal ) চিন্তন প্রক্রিয়াতে কোনও স্থূল বা সূক্ষ্ম উচ্চারণ ( অথবা স্থূল বা সূক্ষ্ম লিখনেব ) প্রয়োজন হয় না। অথচ, এই মধ্যমা-শব্দের ব্যবহার নিশ্চয়ই হয়েছে, অর্থাৎ উচ্চারণাতীত ( অতএব লিখনাতীত ) বিষয়ের অভিধান ( নির্দেশ ) নিশ্চয়ই হয়েছে। এ-এক অদ্ভুত ব্যবহার। এখানে ব্যবহৃত শব্দরাজি এবং অভিহিত ( আরও ভাল ভাবে বলা যায় 'দ্যোতিত' ) সম্বন্ধাবলী সাধারণ ( normal ) ব্যবহার কালে পরস্পর ভিন্ন হয়েও অভিন্ন বোধ হয়। তদ্রূপ ঐ ঐ শব্দের ও অর্থের জ্ঞান-ও। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এখানে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। যতটা জোরে ভিন্ন বলা যায় ঠিক ততটা জোরেই অভিন্ন বলা যায়। অন্ততঃ জ্ঞান ও অর্থের দিক বিবেচনা করলে এ-ব্যাপারটা অতি স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়। ইংরাজিতে এদেরই পারিভাষিক সংজ্ঞা হল categories, এবং প্রতিটি category ( ভারতীয় দর্শনে অনেক সময়ে এদের বলা হয় 'পদার্থ' ) যতটা জ্ঞান ( অথবা চিন্তার ভঙ্গী )-স্বরূপ, ঠিক ততটাই বিষয় বা অর্থ। কেবল, এগুলিকে বিষয়-সামান্য বা possible objects বলতে হবে। মজার কথা, এই ভেদাভেদ স্বীকারে কোনই স্ববিরোধের অনুভূতি থাকে না।

এই মধ্যমা বাক্ অনেক-স্তরীয় এবং প্রতি স্তরে অনেকবিধ। সর্বোচ্চ স্তরে এর অভিন্ন আকার হল Formal Logic শাস্ত্রের বিভিন্ন forms, যে form গুলি একদিক থেকে যেমন চিন্তনভঙ্গী মাত্র তদ্রূপ অন্য দিক থেকে বিবেচনা করলে স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় যে তাদের প্রত্যেকটিই বিষয়জগতের, অর্থাৎ অর্থজগতের, এক একটি ব্যাপকতম ( most pervasive ) রূপ : তারা প্রত্যেকেই ব্যাপকতম বিষয়ও বটে। এই বিষয়ত্বের দিকটা বাদ পড়লেই পাশ্চাত্যদর্শনে চিরাচরিত ( traditional ) Formal Logic আধুনিক Symbolic Logic-এ পরিণত হয়। আধুনিক Symbolic Logic-এর form গুলি কেবলই জ্ঞানীয় বা ভাষাগত মৌলিকতম syntax-structure. এগুলিকে কোনও ভাবে বিষয় বলার বিন্দুমাত্র তাগিদ থাকে না। দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে এই Logic একজাতীয় technical দক্ষতা অর্জনের উপায়বিশেষ

—এদের সমান্তরাল কোনও বিষয় থাকবে, এমন দাবি এই Logic করে না। কিন্তু চিরাচরিত Formal Logic-এর সেই দাবি থাকে, অথচ সেক্ষেত্রে form-রূপ বিষয়াবলী ( অর্থাবলী ) ও form-রূপ জ্ঞানাবলী বা শব্দাবলী ( বাক্ ) পরস্পর ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। এই হল মধ্যমাবাকের মৌলতম স্তর। তন্নিম্ন সন্নিহিত কোনও স্তরে থাকে কান্টীয় বা তজ্জাতীয় categories, যেগুলির প্রত্যেকটি জ্ঞান বা বাকের নিজস্ব ভঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও তৎ তৎ বিষয়েও আদিমতম স্বাভাবিক রূপ, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নিজ নিজ মাহাত্ম্যেই বিষয় ( অর্থ )-ও বটে। কান্টের ভাষায় এরা possible objects, different forms of objects anticipated *a priori*। এই কান্টীয় categories-এর নিম্নে বিভিন্ন স্তরে থাকে এমন সব বিভিন্ন স্থূলতর বিষয়-সামান্য ( universals as objects ) যেগুলি যতখানি 'বিষয়' ঠিক ততখানি জ্ঞান ( চিন্তা )-রূপ এবং বাক্-রূপও বটে ; দৃষ্টান্ত :—দিক্‌কালীয় সম্পর্ক, এবং যাবৎ স্থূল আপেক্ষিক ধর্ম (concrete relations )। এরও নিম্নস্তরে পড়ে যাবৎ স্থূল ( empirical ) universals ( সামান্য )। এই universal-গুলিও ঠিক যতটা জ্ঞান ( চিন্তা )-ভঙ্গী, ততটাই বিষয়ও বটে, এবং ঠিক ততটাই বাক্-ভঙ্গী বলেও মানতে হয়। এই জন্যই বিভিন্ন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য ( universal )-সংক্রান্ত তিনপ্রকার মতই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শৈব-অদ্বৈতী ও শাব্দিক দার্শনিক ছাড়া কেউই এই সামান্যগুলিকে ত্রিতয়স্বভাব বলে ধরেন না। অথচ, একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় এঁদের পারস্পরিক বাক্‌বিতণ্ডার মধ্য দিয়েই এই ত্রিতয়ত্ব কেমন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রুতিত্বাবচ্ছেদে সব শ্রুতিই ( scripture ) এই-জাতীয়-মধ্যমাবাক্-শরীর।

মধ্যমা শব্দের চেয়েও সূক্ষ্মতর শব্দ হল যে-কোন শব্দের ( পারিভাষিক ভাবে বলা হয়, শব্দত্বাবচ্ছেদে বা শব্দত্বপুরস্কারে সব শব্দেরই ) সহজ স্বাভাবিক অভিধাশক্তি=spontaneous meaning reference। কেবল শব্দের নয়, তৎ তৎ শব্দসমান্তরাল জ্ঞানেরও ( চিন্তনেরও ) এই স্বাভাবিক meaning reference ( বিষয়িতা ) থাকে। যে-কোন স্থূল শব্দের উচ্চারণকালে শব্দটি যে কোন-এক পদার্থের বাচক, এ-কথা নতুন করে উচ্চারণ করতে হয় না ( অবশ্য meta দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে )। অনুচ্চারিত এই অভিধা ( meaning reference ) ঐ স্থূল শব্দের বাচ্য বস্তুটির সঙ্গে একেবারে একীভূত, নিরবশেষে একাকার। ঐ একই কথা জ্ঞান ও তার স্বাভাবিক বিষয়িতা ( meaning reference ) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাচ্যের সঙ্গে একীভূত এই শব্দ কিন্তু

উপরিউক্ত মধ্যমা শব্দের চেয়ে সূক্ষ্মতর। মধ্যমা বাক্ সূক্ষ্ম হলেও মূর্ত ( concrete ), বিভিন্ন পদার্থের বা শব্দের structure-আত্মক। এখানে কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি শুধু এইটুকুতে পর্যবসিত যে, প্রতি বাচক শব্দের ব্যবহারে **কিছু-একটা** বাচ্য থাকেই। স্থূল শব্দের দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ বস্তুটি নিশ্চয়ই ঐ স্থূল শব্দ থেকে পৃথক, অর্থাৎ ঐ শব্দের বাইরে থাকে; কিন্তু **'কিছু-একটা** বাচ্য' বলে যাকে নির্দেশ করছি সে ঐ ভাবে ভিন্ন নয়, ঐ ভাবে বাইরে থাকে না। এখানেই প্রথম উপলব্ধি হয় যে, আমার উচ্চারিত স্থূল শব্দ **কিছু-একটা** বাচ্য বস্তু ( object ) উপস্থাপিত করছে, contruct করছে, 'intend' করছে, কল্পনা করছে। একেই বলে 'বাক্ ( speech ) কর্তৃক বিষয়-মহাসামান্য ( object-in-general ) কল্পন ( construction )'। যে-বাক্ এই ভাবে বিষয়-মহাসামান্য সৃষ্টি ( উপস্থাপন=কল্পনা ) করে সে আবার চিন্তা (thinking)-রূপ অনুচ্চারিত বাকের সঙ্গে স্পষ্টতঃ অভিন্ন, এবং এই অভিন্নত্ব বাকের সঙ্গে structural relation-এর যে অভিন্নত্ব, তার চেয়েও সূক্ষ্মতর। এই তৃতীয় সূক্ষ্ম পর্যায়ের শব্দ বা বাকের নাম 'পশ্যন্তী বাক্' বা 'পশ্যন্তী শব্দ'। স্থূল, উচ্চারিত ( তা সে উচ্চারণ ভৌতিক—physical—বা মানসিকই হোক ) শব্দের নামই বৈখরী শব্দ। বৈখরী-বাকের ক্ষেত্রে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান স্পষ্টতঃ পরস্পর ভিন্ন।

বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তী, তিন ক্ষেত্রেই এদের বিভিন্ন প্রকার 'শব্দ' না বলে বিভিন্ন প্রকার 'বাক্' ( speech ) বললে সমস্ত ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। কারণ বাক্ বা speech বা speaking এই তিনই হল চিন্তন বা thinking রূপ চিদ্‌ব্যাপার, যাকে ইংরাজিতে বলা হয় subjective, যারই পটভূমিতে বিষয়ের প্রথম সূক্ষ্মতম উপস্থাপন ( কল্পনা বা construction ) হয় পশ্যন্তী বাকে, বিষয়ের স্থূলতর কিন্তু এখনও-অমূর্ত ( non-concrete ) উপস্থাপন ( কল্পনা বা construction ) হয় মধ্যমা বাকে, এবং স্থূলতম মূর্ত বিষয়ের অভিধা ( বাচিক নির্দেশ ) হয় বৈখরী বাকে। বৈখরী বাকে বাক্ ও বাচ্যের অভিন্নত্বের কোনও উপলব্ধি নেই; বাচ্য সেখানে বাক্-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু বলে মনে হয়, ঠিক যেমন জাগ্রৎ অবস্থায় জগৎ এবং জগতের সব বস্তু জ্ঞাতৃ (এমন কি ব্যাবহারিক জীবরূপ জ্ঞাতৃ )-নিরপেক্ষ বলে মনে হয়। কিন্তু সেখানেও অদ্বৈতবেদান্তী যে-প্রক্রিয়ায় ঐ সব বস্তু ও তাদের জাগতিক জ্ঞাতা জীবকে আখেরে শুদ্ধ চিতের অনির্বচনীয় আভাস বলতে চান ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই তিনি বৈখরী বাক্ ও তদ্‌বাচ্য স্থূল বস্তুকেও আখেরে শুদ্ধতম পরাবাকের অনির্বচনীয় আভাস বলবেন।

পশ্যন্তী বাকেরও ঊর্ধ্বে পরাবাক্। এই অবস্থায় বাক্ বা চিত্তের কোনও বহির্মুখিতা নেই, কোনও বিষয়-মহাসামান্য এখনও উপস্থাপিত হয় নি। এই পরাবাক্ অবস্থায় চিৎ=আত্মা=শিব কেবল নিজেই নিজেকে 'শুদ্ধ অহং' ( subjectivity-in-general ) বলে জানে। পশ্যন্তীতে যদি 'ইদং' উপস্থাপিত হয়, পরাতে উপস্থাপিত হয় 'অহম্'। এইটাই চিত্তের 'আত্ম-সচেতন' ( self-conscious ) অবস্থা।

শৈবেরা এরও ঊর্ধ্বে অনুত্তর শিব ( consciousness-in-itself—as distinct from subjectivity-in-general ) মানেন, যে-শিব এই অনুত্তর অবস্থায় এখনও আত্মসচেতন নয়। কিন্তু শাব্দিক দার্শনিকেরা এবং গৌড়পাদ ( অতএব, কারিকাভাষ্যকার শঙ্কর ) এই পরাবাক্, অর্থাৎ আত্মসচেতন চিৎ অবস্থাতেই ( স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে ) থেমে যান। তাঁদের মতে চিৎ স্বতঃই ( অর্থাৎ তথাকথিত অনুত্তর অবস্থাতেই ) আত্মসচেতন। এটা, অবশ্যই, অদ্বৈতবেদান্তের মূল কথা। কিন্তু মাণ্ডূক্যকারিকাকার গৌড়পাদ এবং কারিকাভাষ্যকার শঙ্করের ক্ষেত্রে একটা অসংগতি থেকে যায়। অসংগতিটা হল এই :

শৈবদের মতে অনুত্তর শিব সর্ব বাকের ( অতএব, পরাবাকেরও ) অতীত। গৌড়পাদ ও শঙ্কর এক্ষেত্রে যদি পরাবাকেই থেমে যান এবং সেই অবস্থাকেই তুরীয় ( =অনুত্তর ) বলেন, তাহলে তো তাঁরা বাক্ অর্থাৎ শব্দকে নিত্য পদার্থ বলে স্বীকার করলেন। অথচ, প্রচলিত অদ্বৈতবেদান্তে—এমন কি শঙ্করের শারীরকভাষ্যেও—কোনও শব্দকে নিত্য বলা হয় নি। মাণ্ডূক্য-কারিকাকার ও কারিকাভাষ্যকার তাহলে পরাবাকে থেমে গেলেন কী করে? এই গৌড়পাদ কি সত্যই অদ্বৈতবেদান্তী? এই শঙ্কর কি সত্যই শারীরক-ভাষ্যকার শঙ্কর? অথবা একই শঙ্কর কি দুই ভাষ্যে কিছুটা বিভিন্ন তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন? অথবা, শারীরকভাষ্যের সব কথা সাধারণতঃ যে-ভাবে বোঝা হয় তা সব সময়ে ঠিক নয়?

এই চারপ্রকার বাকের, অর্থাৎ চিত্তের এই চার প্রকার অবস্থার, প্রতীক হল জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা। [ প্রকৃতপক্ষে, এই তুরীয় অবস্থা কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ, প্রতীক নয়। ] জাগ্রৎ অবস্থা পুরোপুরি ব্যাবহারিক জগতের প্রতীক। যে-ভাবেই হোক, এই ব্যাবহারিক জগতের মধ্যেই যে-সব স্বাপ্নবস্তু ও মিথ্যা সর্পাদি এবং তৎতৎ-মিথ্যাদর্শন ও তৎতৎ-মিথ্যাদর্শনের কর্তা যে-সব মিথ্যা জীব দৃষ্ট হয়, তাদের বিশ্লেষণমুখে অদ্বৈতীর কাছে এটাই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে যে, এ-সবই ঠিক যতটা পরিমাণে বিষয় ( object=অর্থ ) ততটা

পরিমাণেই বিষয়ী (subjective=জ্ঞান=বাক্)। এবং এই-ই হল মধ্যমা বাকের খেলা, যে-মধ্যমাবাক্ আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জগতের অব্যবহিত উপরিস্তরীয় (আপেক্ষিক) সত্য। আবার, সুষুপ্তি যেমন অজ্ঞানসম্বলিত চিন্মাত্র, পশ্যন্তীবাক্ ও তদভিন্ন বাচ্য subject-in-general-ও ঠিক সেই প্রকার পরাবাক্ (pure speaking=pure subjectivity)-এর প্রথম সূক্ষ্মতম মূর্তন (concretion)। পুনশ্চ, স্থূলজগৎ যেমন স্থূলতম construction, বৈখরী বাক্ ও তার বাচ্য স্থূল বিষয়-ও ঠিক তদ্রূপ স্থূলতম construction।

অধ্যাত্মশাস্ত্রে এই তত্ত্বই পরিবেশিত হয়েছে উপর থেকে নিচে নেমে আসার পদ্ধতিতে, অর্থাৎ সৃষ্টিমুখে, সৃষ্টির ভাষায়। প্রথমেই সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে ব্রহ্ম একা ছিলেন। তার পরে বলা হয়েছে, 'স ঐক্ষত', 'তস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ', 'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদি, এবং তজ্জাতীয় প্রসঙ্গেই বিপরীতমুখে চিন্মাত্র ব্রহ্মকে বা আত্মাকে বলা হয়েছে যে, তিনি সব বাকের অতীত—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে…'। সর্ব বাকের অতীত পরমাত্মা প্রথমে[১] নিজেকে 'আমি', অর্থাৎ subjectivity par excellence, বলে জাহির করলেন। স্পষ্টতঃই শাস্ত্রকার বলতে চান এই প্রাথমিক বিশুদ্ধতম 'আমি' (subjectivity) শুদ্ধ আত্মার মিথ্যা বিকার। শুদ্ধ আত্মা এই বিশুদ্ধতম subjectivity'রও অতীত চিৎস্বরূপ (consciousness-in-itself)। কিন্তু একবার একে 'আমি' বলে বুঝলে আরও নেমে আসতে হবে। 'আমি' অথবা subjectivity তখনই সার্থক বাক্ যখন এটা 'ইদং' অর্থাৎ বিষয়-মহাসামান্যের পটভূমিতে উপলব্ধ হয়। পক্ষান্তরে, সাধনপথে উচ্চ এক অবস্থায় 'শুদ্ধ ইদং' বা object-in-general পাবার পরেই তন্নিষেধে তদূর্ধ্ব ঐ বিশুদ্ধ 'আমি' বা subjectivity উপলব্ধিগোচর হয়, এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়[২] বিপরীত ক্রমে প্রথমে 'অহং' ও তারপর 'অহং'-এর প্রতিরূপ 'ইদম্' সৃষ্ট[২] হলেও ঐ 'ইদং'-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রথমে নিজেকে 'অহং' বলে আখ্যাত করলেন। এই মূলীভূত প্রাথমিক অহমাখ্যানই পরাবাক্—পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পরাবাকেরই ইংরাজি নাম pure

---

১। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে এখানে কোনও কালিক প্রাথম্য, দ্বিতীয়ত্বাদির কথা বলা হচ্ছে না।

২। তা সে সৃষ্টি মিথ্যাই হোক আর সত্যই হোক।

subjectivity। নিষ্কল কূটস্থ আত্মা এই subjectivity-ও অতীত। অদ্বৈতবেদান্তে তাঁকে যে-চিৎস্বরূপ বলা হয় সে চিৎ ইদমের-প্রেক্ষিতে-বোধ্যব্য-যে-অহন্তা তা নয়। কূটস্থ চিৎ অদ্বৈতবেদান্তমতে নিরহন্তাক চিন্মাত্র, যদিও কূটস্থ অবস্থাতেও আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ।

সর্ব বাকের অতীত এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা প্রথমে নিজেকে 'অহং' বলে আখ্যাত করলেন। এই 'অহং' আখ্যানই পরা বাক্ বা শব্দব্রহ্ম। তারপরে বিবর্তমুখে তিনি উপস্থাপিত করলেন 'অহং'-এর প্রতিরূপ 'ইদম্' বা object-in-general। এই উপন্যাসের নাম পশ্যন্তী বাক্। তার পর উপন্যস্ত করলেন মাতৃকারূপ বর্ণাবলী, তাদের বিভিন্ন structural synthesis এবং অন্যান্য pure syntax structures যেগুলি মূলতঃ সর্ব ভাষার একই syntax, এবং ক্রমে বড় ছোট নানা categories ও তদুপরি যাবৎ স্থূল universals। এই অবস্থায় বাকের নাম মধ্যমা। এর পরে, আবার, বিবর্তমুখে সৃষ্টি করলেন চতুর্থ অবস্থা, যেখানে একদিকে থাকে বৈখরী বাক্, অন্য দিকে থাকে স্থূল বস্তুনিচয়। বাক্-রূপী, বা বাকের সঙ্গে সমান্তরাল, জ্ঞানেরও এই একই ইতিহাস।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ, মাণ্ডুক্যকারিকা এবং তার শাঙ্করভাষ্য অদ্বৈতবেদান্ত পরিজ্ঞাপক অধ্যাত্মশাস্ত্র। তাই এই তিন শাস্ত্রে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিবর্তমুখেই বর্ণনা করা হয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধেরাও মোটামুটি তাই বলবেন। কিন্তু সাঙ্খ্যযোগ ও অদ্বৈত শৈবদর্শন যথার্থ সৃষ্টির, অর্থাৎ পরিণামের, কথা বলেন। বিবর্তজাত সবই মিথ্যা। কিন্তু পরিণামরূপ বিকার স্বতঃই মিথ্যা নয়। সাঙ্খ্যযোগ এ-জাতীয় সত্য পরিণামের কথা বলেন, এবং তাঁরা একথা বলতে যে পারেন তার প্রধানতম, এবং বোধ হয় একমাত্র, হেতু হল তাঁদের মতে এই পরিণাম কোনও ভাবে চির অচঞ্চল, নির্বিকার চিন্মাত্র পুরুষের নয়, এ পরিণাম চিরচঞ্চল প্রকৃতির। অদ্বৈতীর মিথ্যা মায়াশক্তিই সাঙ্খ্যযোগের প্রকৃতি। তাই এই 'প্রকৃতির পরিণাম' বলাতে তদংশে অদ্বৈতবেদান্তের সহিত তাঁদের বিরোধ নেই। বিরোধ হল সেইখানে যেখানে অদ্বৈতী মায়াকে আত্মার অজ্ঞানরূপ মিথ্যা শক্তি বলে প্রথম থেকেই ঐ শক্তিকে নস্যাৎ করতে চান। সাংখ্যযোগ সেখানে ঐ শক্তি বা dynamism-কে প্রথম থেকে পুরুষভিন্ন, স্বতন্ত্র, চিরপরিণামী ( ever dynamic ) এক সত্য তত্ত্ব বলে গ্রহণ করেন, যদিও এই প্রকৃতির যাবৎ বিরূপ পরিণাম পুরুষের সান্নিধ্যেই ঘটে—পুরুষকে অজ্ঞানরূপ মোহযুক্ত করে অথবা বিপরীতমুখে পুরুষকে মোহমুক্ত করবার জন্য, অর্থাৎ অনুলোম প্রতিলোম উভয় প্রক্রিয়ায়।

অদ্বৈত শৈবদার্শনিকেরাও চিরস্পন্দমানা ( ever dynamic ) মূলা শক্তির পরিণাম মানেন অনেক দূর পর্যন্ত, এবং এই মূলা শক্তি কূটস্থ শিব থেকে একান্ত ভিন্ন নন, মিথ্যাও নন। তিনি যথার্থই শিবের শক্তি কিন্তু অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় তাঁর সঙ্গে সমরস। অনেক দূর পর্যন্ত, অর্থাৎ তত্ত্বাতীত শিবশক্তির রাজ্য থেকে আরম্ভ করে সারা শুদ্ধতত্ত্বের মধ্য দিয়ে এসে শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ও পঞ্চকঞ্চুকের রাজ্য পর্যন্ত, শিবসমরস শক্তির যথার্থ পরিণাম হয়। কেবল বুদ্ধি-অহংকারাদি অশুদ্ধ তত্ত্বে এসে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের—মূলে অবিদ্যার—ক্রিয়াবশতঃ এই পরিণাম অনেক মিথ্যা ও দুঃখদায়ক বিষে জর্জরিত হতে থাকে। তখন থেকেই মিথ্যার সৃষ্টি। তবুও শৈব ও সাঙ্খ্যযোগের মিথ্যা অদ্বৈতবেদান্তীর নিঃসার বিবর্ত নয়। বেদান্তীদের মধ্যে ভাস্কর ও ভর্তৃহরিও এই জাতীয় যথার্থ সৃষ্টি, যথার্থ পরিণামের, পরিপোষক। Trancendentalists, অর্থাৎ অতিকান্তিবাদী বা পরমার্থবাদীদের মধ্যে এঁদের সংখ্যাই সমধিক। বাক্ ও অর্থ সম্বন্ধীয় এঁদের কথাই কবি কালিদাস তাঁর অমর শ্লোকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥"